জানুয়ারি ২০২২ ■ পৌষ- মাঘ ১৪২৮

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

খোকা ঘরে ফিরেছে

কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না

আয়ান হক, দ্বিতীয় শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

তাছনিম আক্তার শিফা, ষষ্ঠ শ্রেণি, কাজকামতা আশ্রদিয়া আলিম মাদরাসা, কুমিল্লা

সম্পাদকীয়

বিদায় নিলো ২০২১ সাল। এসে গেল নতুন বছর ২০২২ সাল। তোমাদের সবাইকে জানাই খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২২-এর শুভেচ্ছা। পুরো বছরটা তোমাদের ভালো কাটুক, সুস্থ থাকো-এই কামনা করি। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এই দিন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন দেশের মাটিতে। জাতির পিতা দেশে ফিরে আসার মাধ্যমে পূর্ণতা পায় আমাদের মহান বিজয়। এই দিনটি কতই না আনন্দের ছিল। তাই ১০ই জানুয়ারি তারিখটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

নতুন বছর! নতুন ক্লাস! নতুন বই! কতই না আনন্দের। নতুন বইয়ের সুঘ্রাণ মনকে প্রফুল্ল করে। তাই তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি বছর তোমাদের হাতে তুলে দেন নতুন বই। বই পেতে তোমাদের বিদ্যালয়ে উৎসব হয়। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে সেই উৎসব এবারও হয়নি। তবুও তোমাদের হাতে পৌঁছে গেছে নতুন বই। নতুন ক্লাসের নতুন বই তোমরা নতুন উদ্যমে পড়াশুনা করবে কিন্তু। ভালোভাবে পড়াশুনা করে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে -এটাই প্রত্যাশা আমাদের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আজ অনেক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতো। স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকেরা ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ২,৫৫৪ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে অনেকেই বলছেন 'উন্নয়ন বিস্ময়'। কথাটি অসত্য নয়। দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল।

ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

নিবন্ধ

কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না/ফরিদুর রেজা সাগর ০৪
খোকা ঘরে ফিরেছে/মুহা. শিপলু জামান ০৭
ইতিহাসে যা ঘটেনি/শাহানা আফরোজ ১০
পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ২০২২/হাছিনা আক্তার ১২
বই পড়ার আনন্দ/নুসরাত জাহান ১৫
মা ও শিশুমৃত্যু রোধে অভূতপূর্ব অর্জন/সেলিনা আক্তার ১৮
কুটুস কাটুস বাদাম খাও/আমির খসরু সেলিম ২৫
কবিতা ও উপাধির শতবর্ষ/জিয়া উদ্দিন জাহিদ ৩৩
কেন হাঁটব শিশির ভেজা ঘাসে/রায়হান সাইফুর চৌধুরী ৪৪
গ্রাম আমাদের ভালোবাসার স্থান/রেজা নওফল ৫১
ছোটো থেকেই শিখতে হবে/আল মামুন ৫৩
করোনার নতুন ধরন/মো. জামাল উদ্দিন ৫৭

গল্প

অমিতের রোজগার/শাম্মী তুলতুল ২২
বেলপত্র বনের পাখিরা/অজিতা মিত্র ২৪
খরগোশ ও লোভী শিয়াল/মোস্তাফিজুল হক ২৬
সত্যবাদী সমির/মমতাজ আহাম্মদ ২৯
কাঠবিড়ালি হলো সুন্দরবনের মন্ত্রী/সাইফুল ইসলাম জুয়েল ৪০
তারান্নুমের অপেক্ষা/ইউনুছ আলী ৪৩

সাফল্য প্রতিবেদন

বিস্ময় বালক সাদ/ মেজবাউল হক ৫৬
অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ চ্যাম্পিয়ন/জান্নাতে রোজী ৫৮
সোনার বাংলা গড়ার শপথ /তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৫৯
নিউজিল্যান্ডে প্রথম টেস্ট জয়/সানজিদ হোসেন শুভ ৬১
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আখি ৬২

বড়োদের কবিতা

০৩ গোলাম নবী পান্না
০৬ আবুল হোসেন আজাদ
১৪ রহমাতুল্লাহ আল আরাবী
১৬ ফারুক নওয়াজ/আহসানুল হক
১৭ শাহরিয়ার আলম/ফারুক হাসান/ বাবুল তালুকদার
৪৬ শাহরিয়ার শাহাদাত/মাসুমা জাহান/সুবর্ণা দাশ মুনমুন
৪৭ প্রত্যয় জসিম/বিচিত্র কুমার/মো. মুনছুর আহমেদ /মো.আবির হোসেন
৫৫ মো. তাফাজ্জল হোসেন/আহনাফ জারীফ আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৩৬ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তফা মাসুদ

স্মৃতিকথা

৪৮ খেজুর গাছের কান্না/ফাতেমা বেগম
৪৯ শীতের রাতে খেজুর রস/রশীদ এনাম

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আয়ান হক/ তাছনিম আক্তার শিফা
শেষ প্রচ্ছদ : রাইসা ইন্তেসার ইমরান
২৩ সায়মা আদিবা আভা
৩৯ মোছাঃ জীম
৫৪ আফনান তারীফ আহমেদ
৫৫ সেঁজুতি শীল
৬০ রুকাইয়া সুলতানা রাহিকা
৬৩ সানজিদা আক্তার রূপা/মো. সফিউল আহসান তোহা
৬৪ সুমাইয়া আক্তার ওহী/সাবিহা তাসবীহ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

নতুন বছর এলে

গোলাম নবী পান্না

বছরের শুরুতেই
নতুনের টানে–
চলার এ পথে যেন
আলো ছোঁয়া আনে,
নতুন সে সুর বাজে
জীবনের গানে।

ছোটোদের বই জুড়ে
রঙের সে খেলা
চোখে-মুখে ভেসে ওঠে
আনন্দমেলা,
নতুনের গন্ধেই–
কেটে যায় বেলা।

নতুন বছর এলে
ভুলে যাই দুঃখ–
মেতে ওঠে ছোটো ছোটো
কচি কচি মুখ
নেমে আসে তাতে যেন
অবারিত সুখ।

কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না

ফরিদুর রেজা সাগর

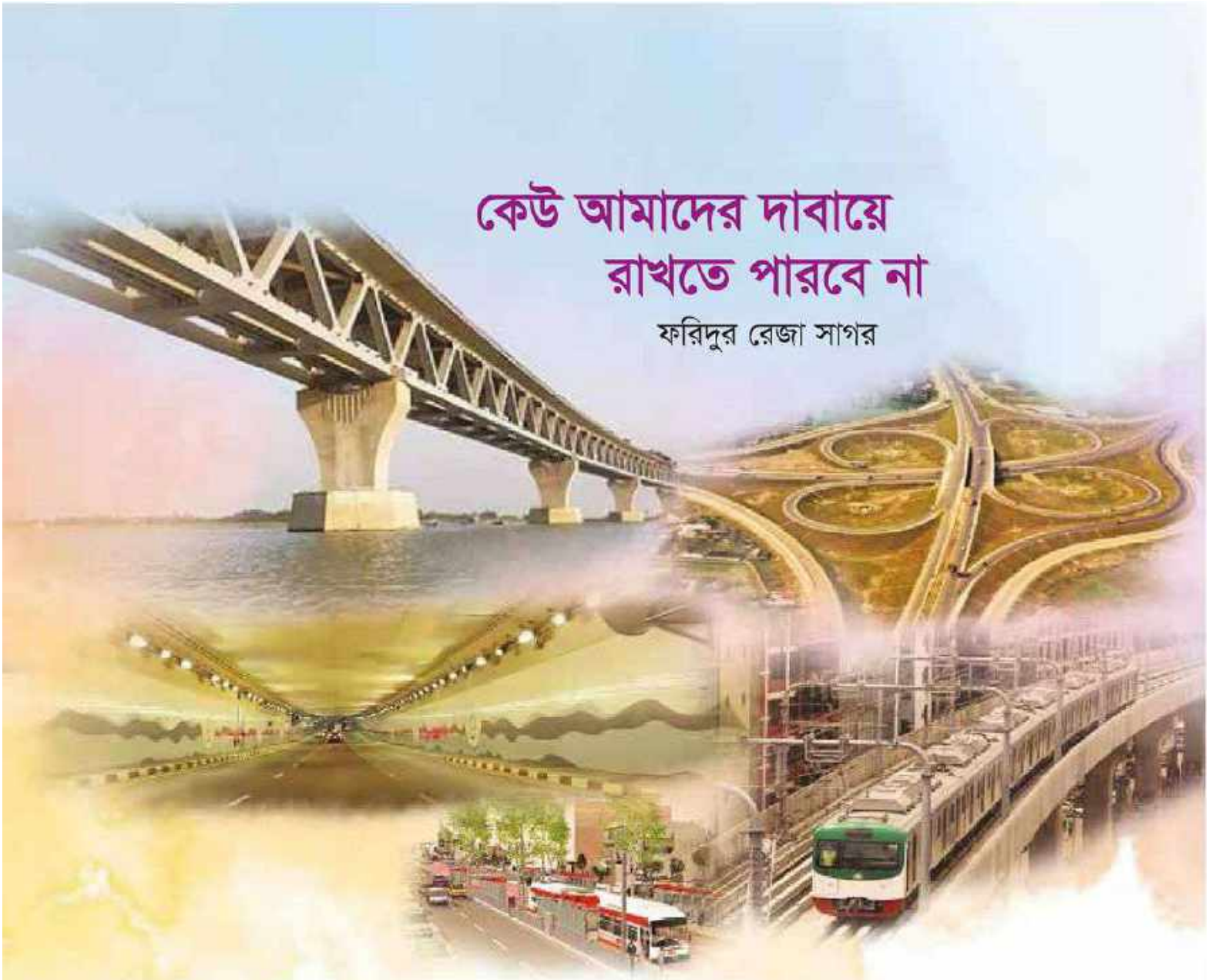

আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে 'সচিব' পদ থেকে অবসরে গেলেন। কথায় কথায় তিনি বলছিলেন, তাঁর বাবা পাকিস্তান আমলে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। বাঙালি হয়ে সচিব হবেন। এটা ছিল দুরাশা। তিনি যখন চাকরি পান তখন দশগ্রামের লোক তাকে দেখতে এসেছিল। কারণ তিনি সরকারি চাকরি পেয়েছেন।

আমার সচিব বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, সচিব হয়ে অবসর নিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে সামান্য সংবর্ধনাও দিল না। গ্রামের মানুষ আমাকে দেখতে এল না। কারণ স্বাধীন দেশে এখন অনেক সচিব। আমি আরো যোগ করলাম। আমাদের ছেলেবেলার বন্ধুদের দিকে দ্যাখো। অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। অনেকে ডাক্তারি পড়েছে কেউ ব্যবসা করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফলতা রয়েছে।

বন্ধু বললেন, আরো বড়ো বড়ো সফলতা এখন বাংলাদেশ জুড়ে। ভেবে দেখলাম, আমাদের অনেক বন্ধু লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন।

ক্রিকেটে আমাদের সাফল্য বর্ণনার অতীত। সাকিব আল হাসান বিশ্বের এক নম্বর অল রাউন্ডার। পঞ্চাশ বছর আগে এসব কি ভাবা যেত? সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের এক বন্ধু গার্মেন্টস শিল্পে ট্রেনিং নেয়ার জন্য কোরিয়া গিয়েছিলেন। এক সদ্য প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস-এর পক্ষ থেকে তাঁর কোরিয়া যাওয়া। ফিরে এসে তিনি নিজের উদ্যোগে গার্মেন্টস

প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তার ফ্যাক্টরি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অভাবনীয় তার সাফল্য।

এছাড়াও বাংলাদেশ এখন নানামুখী শিল্পসাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। আমাদের উৎপাদিত প্রোডাক্ট সারা দুনিয়ায় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের মালিকরা ব্যবসা সম্প্রসারিত করছেন দেশে-বিদেশে। আমাদের ওষুধ সামগ্রী, ফুড প্রোডাক্ট পাওয়া যায় সারাবিশ্বে। অভাবনীয় এই সাফল্য।

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল একটি দেশ। যাতায়াত ব্যবস্থায় আমরা অনেক উন্নয়ন সাধন করেছি। বাংলাদেশ বিমান উড়ে যায় দেশ-দেশান্তরে। আমাদের দক্ষ পাইলটেরা চাকরি করেন বিদেশি এয়ারলাইন্সে।

যখনই বিদেশে যাই তখন দেখা হয় স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙালি ভাইদের সাথে। কত ধরনের পেশায় তারা নিয়োজিত আছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী ছাড়াও অন্যান্য পেশা। আমরা অনেক দক্ষ। অনেক কুশলী। দুনিয়াব্যাপী আমরা ছড়িয়ে পড়েছি বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা হাতে।

বাংলা ভাষা এখন পৃথিবীতে স্বীকৃত অন্যতম মাতৃভাষা। আমাদের সংগ্রামী একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পুরো পৃথিবীতে পালিত হয়।

আমাদের বন্ধুরা হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড কিংবা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিষয় কিংবা উচ্চতর গবেষণা করছেন। পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করছেন। পরাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসন নিয়ন্ত্রিত একটি মাত্র টেলিভিশন ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে এখন পঁচিশটির অধিক টেলিভিশন চ্যানেল। রেডিও আছে অনেকগুলো। স্বাধীন মত ও আদর্শে বিশ্বাসী অনেক দৈনিক পত্রিকা আছে। আমাদের নিজস্ব চলচ্চিত্র আছে। আমরা নিজের পরিচয়ে বিশ্বকাপে অংশ নিই। অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করি। জাতিসংঘে আমরা শক্ত প্রতিনিধি।

আমরাই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করি। আমাদের বন্ধু স্থানীয় অগ্রজ ও অনুরক্তরা দেশের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। পেছনে তাকালে কত স্মৃতিই না মনে ভেসে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন জীবন কাটিয়েছেন! আমরা কেমন কাটচ্ছি? পরাধীনতা আর স্বাধীনতার পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। আমার এক বন্ধু চিকিৎসক। তিনি বললেন, বিদেশে যখন তিনি উচ্চতর পড়াশোনা করতেন তখন অনেক সম্মান দিত সবাই তাকে। সেই বন্ধু দেশসেবার জন্য পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরলেন। এখানকার হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এখন তিনি বিশাল হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। শত শত রোগী তার চিকিৎসায় সুস্থ ও নীরোগ জীবনযাপন করছেন।

আমার আরেক বন্ধু মতিঝিলে ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে জীবন শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি বিশাল ভূসম্পত্তি ও কলকারখানার মালিক। এরকম অসংখ্য সাফল্যের গল্প উল্লেখ করা যায়।

বাঙালিরা সমুদ্র জয় করেছে। মহাকাশ জয় করছে। একটা স্বাধীন দেশ আমাদের। একটা নিজস্ব পতাকা আমাদের। আর তৈরি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে সাফল্যের গল্প।

আর এসবই সম্ভব হয়েছে এক মহান বাঙালি নেতার জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে। তিনি আপোশহীন, স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালির চিরকালের নেতা বঙ্গবন্ধু।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা আমাদের সবচেয়ে অনুপ্রেরণা। আজ উপলব্ধি করি আসলেই আমাদের কেউ শত চেষ্টা করেও দাবিয়ে রাখতে পারেনি। পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল নতুন একটি দেশ বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনায় আমাদের যাত্রা শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের সড়ক পথে এগিয়ে চলছে। আর নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।■

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই টেলিভিশন

ফিরলেন তিনি

আবুল হোসেন আজাদ

নীলাভ আকাশ গনগনে রোদ বাতাসে খুশির ঢেউ
এত খুশি আজ কেন গো তোমরা বলতে পারো কি কেউ ?
ফুলেরা হাসল পাখিরা উড়ল অলিরা মেলল ডানা
ডিগবাজি খেল ধান ওঠা মাঠে ঘাস ফড়িঙের ছানা।

সাগর ডাকল নদী তুই আয় একসাথে করি খেলা
তোলপাড় তোলা উছল ঢেউয়ে ভাসাই খুশির ভেলা।
এত উছলিত এত ভালোলাগা কেন এই দিন ঘিরে
বঙ্গবন্ধু আসলেন তাই কারাগার থেকে ফিরে।

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চে গ্রেপ্তার করে তাঁকে
পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলে যে আটকে রাখে।
ফিরলেন তিনি দেশের মাটিতে বাহাত্তরের দশ জানুয়ারি
সেদিনের কথা ভুলিনি আমরা ভুলতে কখনো পারি ?

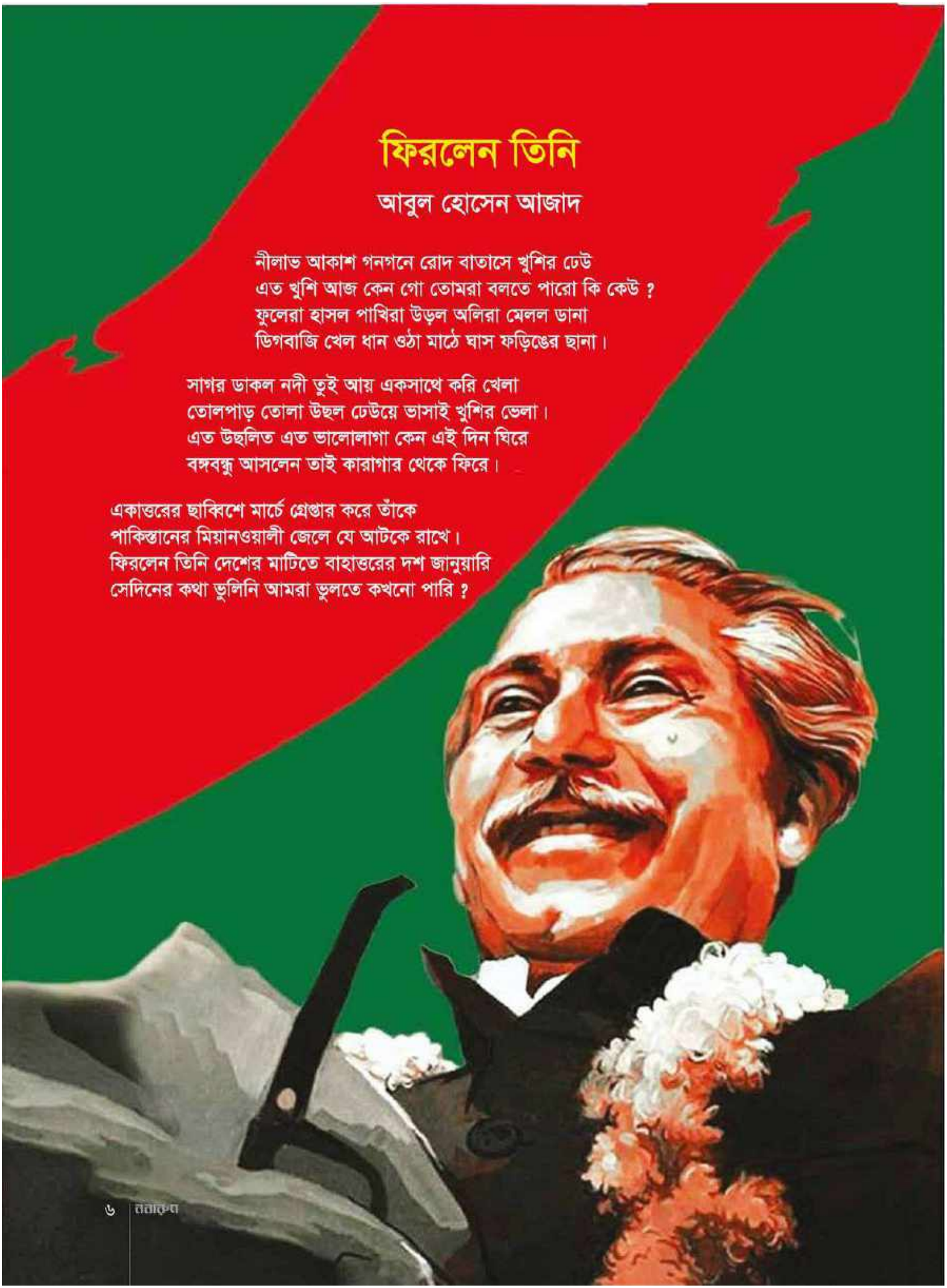

খোকা ঘরে ফিরেছে

মুহা. শিপলু জামান

ছোটোবেলায় স্কুল জীবনের শুরুর দিকে একটি কবিতা পড়তাম আমরা, সেখানে 'মা' তাঁর আদরের খোকন সোনাকে ঘরে ফিরে আসতে বলে। পৃথিবীর প্রত্যেক 'মা'র ডাকেই সন্তানরা তাঁদের কোলে ফিরবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা মা-সন্তানের ভালোবাসা চির অম্লান ও অটুট। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি 'বাংলাদেশ' নামক মায়ের টানে, গভীর ভালোবাসা নিয়ে বাংলা মায়ের বুকে ফিরে এসেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান ' খোকা' অর্থাৎ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিন থেকে প্রতি বছর ১০ই জানুয়ারি পালন করা হয় 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' হিসেবে।

নবারুণের খুদে পাঠক অর্থাৎ নতুন প্রজন্ম যারা আগামী দিনের কাণ্ডারি তাদের জন্য বাংলা মায়ের খোকার ঘরে ফিরে আসার পটভূমি সংক্ষেপে সুপাঠ্য আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব এই লেখায়– আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ, যেখানে আমরা মুক্ত

আকাশে প্রাণভরে নিশ্বাস গ্রহণ করি, তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে এদেশের মানুষকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রাণের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীন দেশের প্রধান রূপকার ও প্রকৌশলী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসকদের কাছে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দুই ভাগে বিভক্ত হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে। পাকিস্তানের আবার দুইটি অংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)। তুলনামূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি হওয়ার পরও পশ্চিমারা পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন ও তাদের জনগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রচলন এমনকি বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকারও কেড়ে নিতে চেয়েছিল। দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর এই শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনা অব্যাহত রাখে। অমানবিক নির্যাতন চালায় বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর উপর, বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় তাঁকে বার বার কারাগারে প্রেরণ করে। বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জীবনের দীর্ঘ সময় জেলে কাটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, থেকেছেন পরিবার থেকে দূরে। তবুও তিনি তাঁর লক্ষ্য আদায়ে পিছপা হননি।

সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকার্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু লাখো জনতার সামনে তাঁর মহাকাব্যিক ভাষণ দেন। মূলত সেই ভাষণেই ছিল স্বাধীনতার ডাক, তিনি বলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধুর সেই অমর কবিতা সেইদিন আন্দোলিত করেছিল প্রতিটি বাঙালি হৃদয়কে, অনুপ্রাণিত করেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে, স্বাধীনতা অর্জন করতে।

পাকিস্তানি শাষকগণও বুঝতে পেরেছিল, বাংলার জনগণকে আর দাবায়ে রাখা যাবে না। তাই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর 'অপারেশন সার্চ' লাইট নামে সশস্ত্র হামলা ও নিধনযজ্ঞ শুরু করে। সেদিন রাত ১২ টার পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ইপিআর-এর পিলখানাস্থ ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর পরপরই পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসা থেকে তাঁকে আটক করে এবং করাচি নিয়ে যায়। বাংলার জনগণ তখনো জানতো না যে তাদের নেতা শত্রুর কবলে আটক আছে, পরবর্তীতে পাকিস্তানি 'ডন' পত্রিকায় আটক বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রকাশ করে। কিন্তু তাতেও বাংলার জনগণকে থামাতে পারেনি বরং আন্দোলন সংগ্রাম আরো তীব্র হয়েছে। সারা দেশে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বাংলার সাধারণ জনগণ তথা কৃষক, শ্রমিক, যুবক-বৃদ্ধ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছে। দীর্ঘ সময় (আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত) বিশ্ব গণমাধ্যমের কাছে বঙ্গবন্ধুর কোনো তথ্য ছিল না। দেশের মানুষও উৎকণ্ঠায় ছিল কিন্তু আশাহত হয়নি। প্রিয় নেতাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে অদম্য বাসনা ছিল সকলের মাঝে। আর সেই আশা পূরণ হতে পারে একমাত্র যুদ্ধ জয় করে, সেটা এদেশের আপমর জনগণ বুঝে গিয়েছিল। তাই বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় শপথ গ্রহণ করে।

এদিকে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরো জোরদার হয়। ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধে যোগদান করলে তা আরো বেগবান হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে তাঁকে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি জেলে নিয়ে যায়, বঙ্গবন্ধুর জন্য তারা জেলের পাশে কবরও খুঁড়ে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত ও সাত কোটি মানুষের ভালোবাসার কাছে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হার মানে। তারা বঙ্গবন্ধুকে স্পর্শ করারও সাহস পায়নি।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের পরাজয় ঘটে, বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জন হয়। কিন্তু স্বাধীনতার মহানায়ক ছাড়া বিজয় ছিল অপূর্ণ ও অতৃপ্ত। যুদ্ধে

পরাজয়ের পর ইয়াহিয়ার কাছ থেকে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। বিশ্ব সম্প্রদায়ের চাপের ফলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেশে না ফেরা পর্যন্ত বাঙালিদের আশঙ্কা কাটেনি। ৯ই জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধু লন্ডন পৌছান। সেখানে তাঁর সাথে দেখা করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ। বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে ও নিরাপদে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন এডওয়ার্ড হিথ। পরে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের ভিআইপি উড়োজাহাজে করে বঙ্গবন্ধু আসেন ভারতের দিল্লিতে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

পরেরদিন অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারি আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যার জন্য অপেক্ষায় ছিল বাংলার আকাশ, বাতাস, তরুলতা আর কোটি কোটি বাঙালি। সেদিন বঙ্গবন্ধু বীরের বেশে মাথা উঁচু করে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন। তখন বঙ্গবন্ধুর চোখে ছিল আনন্দাশ্রু, স্বাধীন দেশে পরিবার ও সাধারণ মানুষের কাছে ফিরে আসার এক অনন্য সুন্দর আবেগ, অনুভূতি আর ভালোবাসা ফুটে উঠেছিল তাঁর চেহারায়। লাখো জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত পথকে জনসমুদ্রে পরিণত করেছিল। দেশের মাটি ছুঁয়ে বঙ্গবন্ধু পরিবারের কাছে না যেয়ে প্রথমেই দেশের মানুষের কাছে চলে গেলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেয়া ভাষণে তিনি বললেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যারা আত্মত্যাগ করেছিল তাদের তিনি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন এবং যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সবাইকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সতর্ক করে দেন এবং দেশ গঠনে যার যার অবস্থান থেকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। সেদিন বঙ্গবন্ধু অর্থাৎ বাংলা মায়ের 'খোকা' ঘরে ফিরেছেন বলেই বাংলার বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিল, জনগণ স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছিল। কেননা বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশকে চিন্তাও করা যায় না। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ, শিক্ষা, ও চেতনা আজও আমাদের সঠিক পথে ধাবিত করে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হৃদয় ধারণ করে দেশের উন্নয়নে সর্বদা কাজ করব– এই হোক সকলের ব্রত।■

উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, পিআইডি

ইতিহাসে যা কখনো ঘটেনি

যুদ্ধবিধ্বস্ত ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যার্বতন সদ্য স্বাধীন বাঙালি জাতির কাছে একটি বড়ো প্রেরণা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ২৯০ দিন পাকিস্তানের অন্ধকার কারাগারে কাটানোর পর লন্ডন -দিল্লি হয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসেন বাঙালির ইতিহাসের বরপুত্র হয়ে। যা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তাঁর ফিরে আসার পথে ঘটেছে আরো কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা। যা তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম:

৮ই জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডি থেকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌছালেন। বিমান থেকে নামার সাথে সাথে এয়ারপোর্টে লাউডস্পিকারে বলা হলো, 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is here.'

বঙ্গবন্ধু তখনো বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান না। কিন্তু তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদায় হিথ্রো এয়ারপোর্টের ভি.আই.পি লাউঞ্জে নেওয়া হলো। ভি.আই.পি লাউঞ্জের প্রধান দরজায় একজন ব্রিটিশ রয়েল গার্ড দাঁড়িয়ে থাকেন। এই রয়েল গার্ড স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোনোরকম নড়াচড়া করার নিয়ম নেই। কিন্তু সেদিন রয়েল গার্ড নিয়ম ভঙ্গ করে এক পা বাড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্যালুট দিয়ে বললেন, 'Sir, we have been praying for you.'বঙ্গবন্ধু রয়েল গার্ডের কাঁধে হাত রেখে মুচকি হাসি দিলেন। রয়েল গার্ডের চোখে তখন পানি রীতিমত টলমল করছিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ বঙ্গবন্ধুকে ফোন করে বললেন, 'আপনাকে আমরা রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মাননা দিচ্ছি। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তায় আপনাকে ক্ল্যারিজ হোটেলে থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধু হেসে বললেন, 'আমি তো রাসেল স্কয়ারে ছোট হোটেলগুলোতে থাকতাম। ওখানে বাঙালিরা সহজে আসতে পারে। আমাকে রাসেল স্কয়ারে ব্যবস্থা করে দাও।'

হিথ উত্তর দিলো, 'দেখো তুমি তো হেড অফ স্ট্রেট হিসেবে আমাদের অতিথি। তোমার সব কথা আমরা মানার চেষ্টা করব। কিন্তু এই কথাটা মানতে পারব না। কারণ হেড অফ স্টেটের নিরাপত্তা শুধুমাত্র ক্ল্যারিজ হোটেলেই হয়।

বঙ্গবন্ধু ক্ল্যারিজ হোটেলে পৌছালেন। তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদায় গার্ড অফ অনার দেওয়া হলো। বিকাল গড়াতেই ক্ল্যারিজ হোটেলের সামনে লোক সমাগম হতে শুরু করল। সাধারণত ক্ল্যারিজ হোটেলের সামনে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। কিন্তু সেদিন ক্ল্যারিজ হোটেলের সামনে এত লোকের সমাগম হয়েছিল যা ইতিহাসের বাইরে।

বঙ্গবন্ধু হোটেলে পৌছে প্রথমে বাংলাদেশে ফোন দিলেন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদকে। তাজউদ্দীনকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার দেশের মানুষ কেমন আছে?'

তাজউদ্দীন উত্তর দিলেন, 'লিডার আমরা সবাই ভালো আছি। কিন্তু দেশের মানুষের একটাই প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু কোথায়? বঙ্গবন্ধু কবে দেশে আসবেন? আপনার জন্য সারা দেশের মানুষ উদগ্রীব হয়ে আছে।'

৯ই জানুয়ারি ১৯৭২, প্রধানমন্ত্রী হিথ। বঙ্গবন্ধুকে বললেন, 'দেখো আমরা খুবই আনন্দিত তুমি রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম আমাদের দেশে এসেছো। আমরা তোমাকে সমস্ত সাহায্য সহযোগিতা করব। কিন্তু এই মূহুর্তে তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলো।'

বঙ্গবন্ধু জবাব দিলেন, 'আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। আমাকে যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করে দাও।'

হিথ সঙ্গে সঙ্গে তার সেক্রেটারিকে বললো, 'দেখো উনাকে ফেরানোর জন্য দ্রুত কোনো ব্যবস্থা আছে কি-না?'

সেক্রেটারি জানাল, 'ব্যবস্থা আছে কিন্তু দুই-তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

এবার হিথ বললেন, 'উনাকে আমার ব্যবহৃত রাষ্ট্রীয় বিমানের ব্যবস্থা করে দাও।

১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ-এর আমন্ত্রণে এক বৈঠকে মিলিত হন মহান এই নেতা। সেখানে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং সব প্রটোকল ভঙ্গ করে নিজ হাতে বঙ্গবন্ধুর গাড়ির দরজা খুলে দেন, যে ঘটনার নজির ইতিহাসে বিরল।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্সের নিরাপত্তায় দেশে ফিরলেন। যা ব্রিটিশ ইতিহাসে কখনো কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য করা হয়নি। ১০ই জানুয়ারি, প্রিয় স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারাগারে থাকতে বারবার বলেছিলেন, 'আমাকে যদি তোমরা মেরেও ফেলো তবু আমার লাশটা প্রিয় বাংলাদেশের মাটিতে পৌঁছে দিও তোমরা।'

বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েই সেদিন দেশে ফিরেছেন। ■

সংগ্রহে: শাহানা আফরোজ

যে বিমানে দেশে ফিরেছিলেন বঙ্গবন্ধু

স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের ২৪ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। যা ইতিহাসের মাইলফলক।

বঙ্গবন্ধু যে এয়ারক্রাফটে দেশে ফিরেছিলেন অবশেষে সেটি শনাক্ত করা গেছে। বর্তমানে এটি জার্মানির হার্মেস্কেইলের একটি প্রাইভেট এভিয়েশন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এটি কমেট ফোর-সি মডেলের এয়ারক্রাফট ছিল। দীর্ঘ কয়েক দশক এটি হার্মেস্কেইলের ফ্লাগুস্টেলাং পিটার জুনিয়র এভিয়েশন মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ এভিয়েশন হাব সূত্রে জানা গেছে, এয়ারক্রাফটটি ১৯৬৩ সালে যুক্তরাজ্যের রয়েল এয়ার ফোর্সের জন্য বানানো হয়েছিল। ১৯৭৫ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের ড্যান-এয়ার লন্ডন নামে একটি এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠানের হয়ে পাঁচ বছর বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করে এটি। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখে এটি জার্মানির ডুসেলড্রফে রাখা হয়। এর কিছুদিন পরই এটি ফ্লাগুস্টেলাং পিটার জুনিয়র এভিয়েশন মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জাতির পিতা পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ৮ই জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৬টায় লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে একটি বিশেষ ফ্লাইট ৬৩৫-এ করে অবতরণ করেন। পরে ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর কমেট বিমানে করে ৯ই জানুয়ারি দেশের পথে যাত্রা করেন বঙ্গবন্ধু। ১০ই জানুয়ারি তারিখ সকালে তিনি নামেন দিল্লিতে। সেখান থেকেই ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ■

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ২০২২ | হাছিনা আক্তার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ –পিআইডি

ছোট্ট সোনামনিরা, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আরো একবার ঘোরা শেষ করল। ২০২১ সাল শেষ হয়ে এসে গেল আরেকটি নতুন বছর ২০২২। করোনা মহামারির কারণে ২০২১ সালের যে সকল উদ্যম ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি আশা করছি ২০২২ সাল আমাদের সে সকল উদ্যম ও স্বপ্নকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের স্বপ্ন আমরা নিজেরাই নির্মাণ করতে পারি। নতুন বছরে শিক্ষায় নিশ্চয়ই আমরা আরো এগিয়ে যাব।

শিশুদের স্কুলমুখী করা, বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা বর্তমান মহামারি পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে জানুয়ারি আমাদের অনেক আনন্দের মাস। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানুয়ারির প্রথম দিনেই ২০১২ সাল থেকে উৎসবের সাথে এ দেশের শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেন নতুন ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক। বিনামূল্যে পাওয়া বইয়ের তাজা ঘ্রাণ ছাত্রছাত্রীদের পথ দেখায় নতুন বছরের, নতুন সাফল্যের।

বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের বিশাল আয়োজন পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশগুলোতেও হয় না। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও শিক্ষার সব বাধা দূর করে শিশুদের স্কুলমুখী করতে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে ছেলেমেয়ে প্রায় সমান হারে স্কুলে যাচ্ছে। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেদের চেয়ে ভালো ফলাফলে এগিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ডিজিটাল সুযোগসুবিধা আমূল পালটে দিয়েছে আমাদের শিশু-কিশোরদের।

মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে গত বছরের মতো এবারো হচ্ছে না বই উৎসব। প্রতিবছর এই দিনে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎসব করে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বই। কিন্তু এ বছর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১লা জানুয়ারি ২০২২ বছরের প্রথম দিন থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু হয়েছে।

এবারের শিক্ষাবর্ষে ৪ কোটি ১৭ লাখ ২৬ হাজার ৮৫৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৪ কোটি ৭০ লাখ ২২ হাজার ১৩০ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এরমধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ৫টি মাতৃভাষায় মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকও রয়েছে।

৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন

বই তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন।

২০১২ সাল থেকে বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সারাদেশে একযোগে বছরের প্রথম দিন ১লা জানুয়ারি শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে বই বিতরণ উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২১ সালে বই উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্ণিলভাবে সাজানো হলেও বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মাধ্যমে, সফলভাবে পহেলা জানুয়ারি ৯ কোটি ৩৭ লাখ ৭৫ হাজার ৮৯৩টি বই শিক্ষর্থীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে ৯ কোটি ৩০ লাখ ৩৪ হাজার ৩০টি, প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৬৬ লাখ ৫ হাজার ৪৮০টি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ২ লাখ ১৯ হাজার ৩৬৪টি সহ মোট ৯ কোটি ৯৮ লাখ ৫৮ হাজার ৮৭৪টি বই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪০০ কোটি ৫৪ লাখ ৬৭ হাজার ৯১১ কপি বই বিতরণ করা হয়েছে।

এ বছর প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক-পঠন-পাঠন সামগ্রীর মধ্যে আমার বই

এবং অনুশীলন খাতা বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৩৩ লাখ ২ হাজার ৭৪০টি।

ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য নিজস্ব বর্ণমালা সম্বলিত মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই প্রণয়ন ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৫টি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) শিশুদের মাঝে প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পাঠ্যপুস্তক বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, চাঁদপুর, ফেনী, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এই মোট ২০টি জেলায় সরবরাহ করা হয়।

প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম বৃহত্তম খাত হচ্ছে শিক্ষা। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে প্রযুক্তি শ্রেণিকক্ষের ভেতর-বাইরে সবখানেই পাঠদান ও গ্রহণের প্রচলিত মাধ্যম হয়ে উঠেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় নতুন সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে হাঁটছে বর্তমান সরকার। ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা। এতসব নির্মল আয়োজনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল শিশু-কিশোররা। আজকে যারা শিশু-কিশোর, তারাই ধরবে কালের মশাল। সেই মশালের আলোই ছড়িয়ে আছে প্রতিটি নতুন বইয়ের পাতায় পাতায়। ইংরেজি বছরের প্রথম দিন সরকার পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিচ্ছে এবং নতুন বইয়ের গন্ধে ভরে যাচ্ছে শিশু-কিশোরদের অন্তর, মন ও প্রাণ। ওরা থাকুক বইয়ের সঙ্গে। বই থাকুক ওদের সঙ্গে। জয় হোক প্রতিবছরের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসবের। ■

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

নতুন বই

রহমাতুল্লাহ আল আরাবী

ছন্দ মুখে গন্ধ শুঁকে
নতুন বইয়ের ঘ্রাণ
খোকা খুকি ইশকুলে যায়
আনন্দে গায় গান।

গন্ধ শুঁকে নতুন বইয়ের
পড়বে মন ভরে
খোকা খুকি ইশকুলে যায়
নতুন বই পড়ে

নতুন বইয়ের নতুন পড়া
ওদের লাগে ভালো
খোকা খুকির কি আনন্দ!
জ্বালাবে জ্ঞানের আলো।

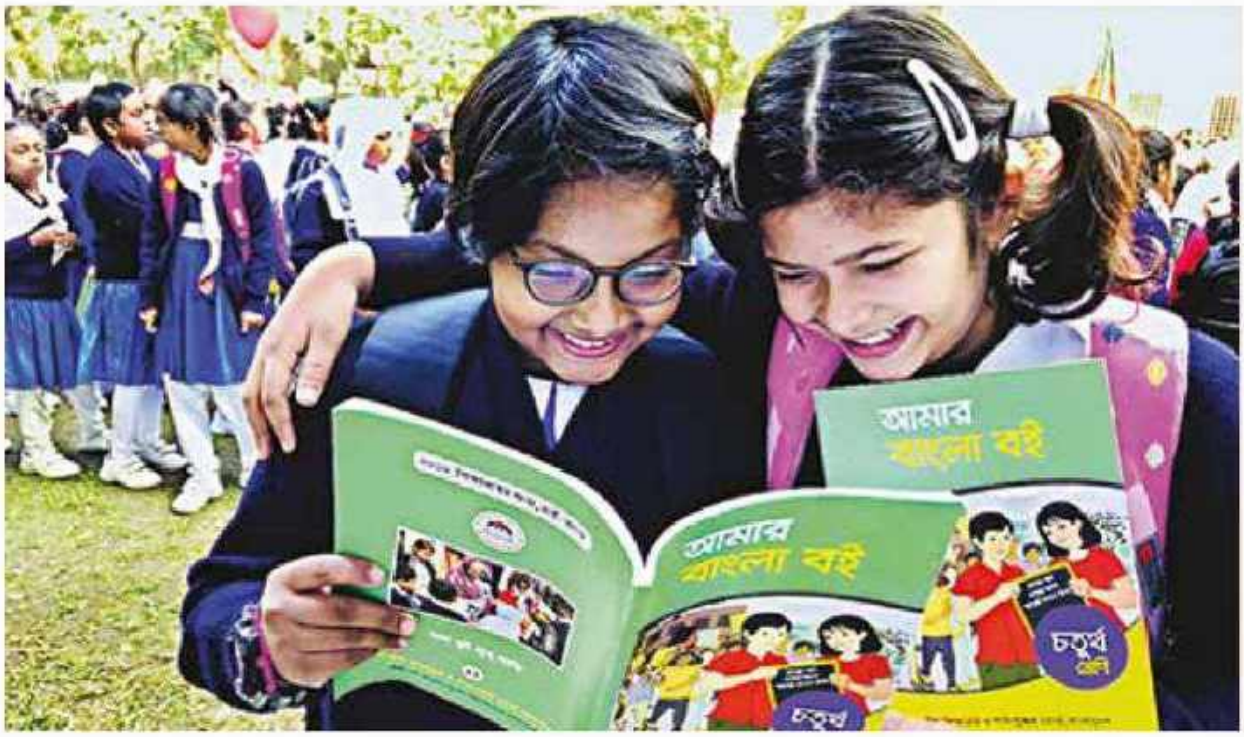

বই পড়ার আনন্দ

নুসরাত জাহান

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে জানাই খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২২-এর শুভেচ্ছা। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ। আজ তোমাদের সাথে বই নিয়ে কিছু কথা বলব।

বন্ধুরা, বই আমাদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ। বই ছাড়া আমরা একটা দিনও কি চলতে পারি? আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নতুন নতুন বই আমাদের যেমন আনন্দ দেয় তেমনি আমাদের অবসর সময়কেও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তাই আমরা বই ছাড়া বাঁচার কথা চিন্তাও করতে পারি না। সেজন্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। তবেই আমরা সমৃদ্ধ মানুষ হতে পারব। বই মানুষের সেরা বন্ধু। তাইতো বই নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা অনেক সুন্দর সুন্দর উক্তি বা বাণী করে গেছেন। যেমন লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, 'বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয় না।' আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া সাঁকো।'

সত্যিই বন্ধুরা, একমাত্র বই-ই মানুষের মনের দুয়ার খুলে দেয়। জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রসারিত ও বিকশিত করে। ভেতরে আলো জ্বেলে দেয়। মূলত জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে বড়ো পথই হলো এই বই পড়া। মানসিক উৎকর্ষতার জন্যও বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাই বন্ধুরা, তোমরা তো ক্লাসের বই পড়বেই, সাথে অন্যান্য শিক্ষামূলক বইগুলোও পড়বে। তবেই তোমরা ধীরে ধীরে জীবন ও দেশ সম্পর্কে অনেক নতুন কিছু জানতে ও বুঝতে পারবে। সর্বোপরি দেশ সেবায় নিজেদেরকে নিয়োগ করতে পারবে। এর চেয়ে ভালো কাজ আর কী হতে পারে।

বন্ধুরা তোমরা তো জানো, বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ করছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি শিশুদের হাতে তুলে দেন নতুন ক্লাসের নতুন বই। করোনা সংক্রমণের কারণে এবার উৎসব করে বই দেওয়া হয়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়। নতুন টাটকা বইয়ের ঘ্রাণে আমাদের শিশুদের মনপ্রাণ ভরে উঠে আনন্দে।

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছর শিশুদের হাতে বিনামূল্যে বই পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। এটা শিশু-কিশোরদের জন্য একটি আশীর্বাদ বয়ে আনে। আমরা আশা করব নতুন বই পেয়ে শিশু-কিশোরদের কোলাহলে ভরে উঠবে আমাদের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন। ■

সম্পাদক, নবারুণ

শীতের
কবিতা

শীতের রাতের বনের কাহিনি

ফারুক নওয়াজ

এই শীত এই কুয়াশা-দিনের ধূসরতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সাদা সারসেরা ভরা সন্ধ্যায় ফিরে গেলে নিজ নীড়ে...
আমি বসে থাকি জানালার পাশে দূর বনে চেয়ে চেয়ে;
নিঝুম আঁধারে প্রদীপ জ্বালাবে কখন জোনাকি মেয়ে।

মিহিন আলোয় আমি দেখে নেবো বনের চলচ্ছবি–
কোনোদিনই যেটা দেখেনি কখনো পৃথিবীর কোনো কবি।
দেখে নেবো আমি পারুল শাখায় শীতে কাঁপা সোহেলিকে
দেখে নেবো আমি শীত চম্পার আড়ালের ডাহুকিকে।

ঝিঁঝিরা শোনাবে পাখিদের এই হিম কষ্টের গাঁথা...
সমব্যথী হয়ে আমি ফেলে দেবো গায়ের নকশিকাঁথা।
শীতের বনের করুণ ঘটনা টুকে নিয়ে সংক্ষেপে–
চমক লাগাবো প্রকৃতির ওই অজানা কাহিনি ছেপে।

জেগে জেগে আমি নিশীথ বনের দৃশ্য দেখব চেয়ে
কান পেতে দেবো যদি রাত জাগা পাখি ওঠে ডুকরিয়ে!
যদি জাওয়া ঝাড়ে শৃগাল শিশুর কান্নার সুর ওঠে...
যদি ঠান্ডাতে কম্পন জাগে বুনো লাফারুর ঠোঁটে...

যদি মরা পাতা ঝরে ঝরে পড়ে মর্মর ধ্বনি তুলে–
সমব্যথী হয়ে জামাটাও আমি রাখব গা থেকে খুলে।
আমি লিখে যাব একা একা বসে চোখে নিয়ে নিবিড়তা
শীতের রাতের বুনো প্রাণীদের বেদনার ইতিকথা!

শীত ছোবলে

আহসানুল হক

শীত ছোবলে হয় যে কাবু
হয় কাবু দেশ পুরো
শীত বুড়িটা থাকে কোথায়
হিমালয়ের চূড়ো ?

পৌষ ও মাঘ এই দু-মাসে
যাত্রা করে শুরু
তার ছোবলে কাঁপতে থাকে
জোয়ান এবং বুড়ো !

দিন গড়িয়ে রাত্রি এলে
ছিটায় বরফ গুঁড়ো
সূর্যটাও তেজ ছড়ায় না
হয় কি অলস, কুঁড়ো ?

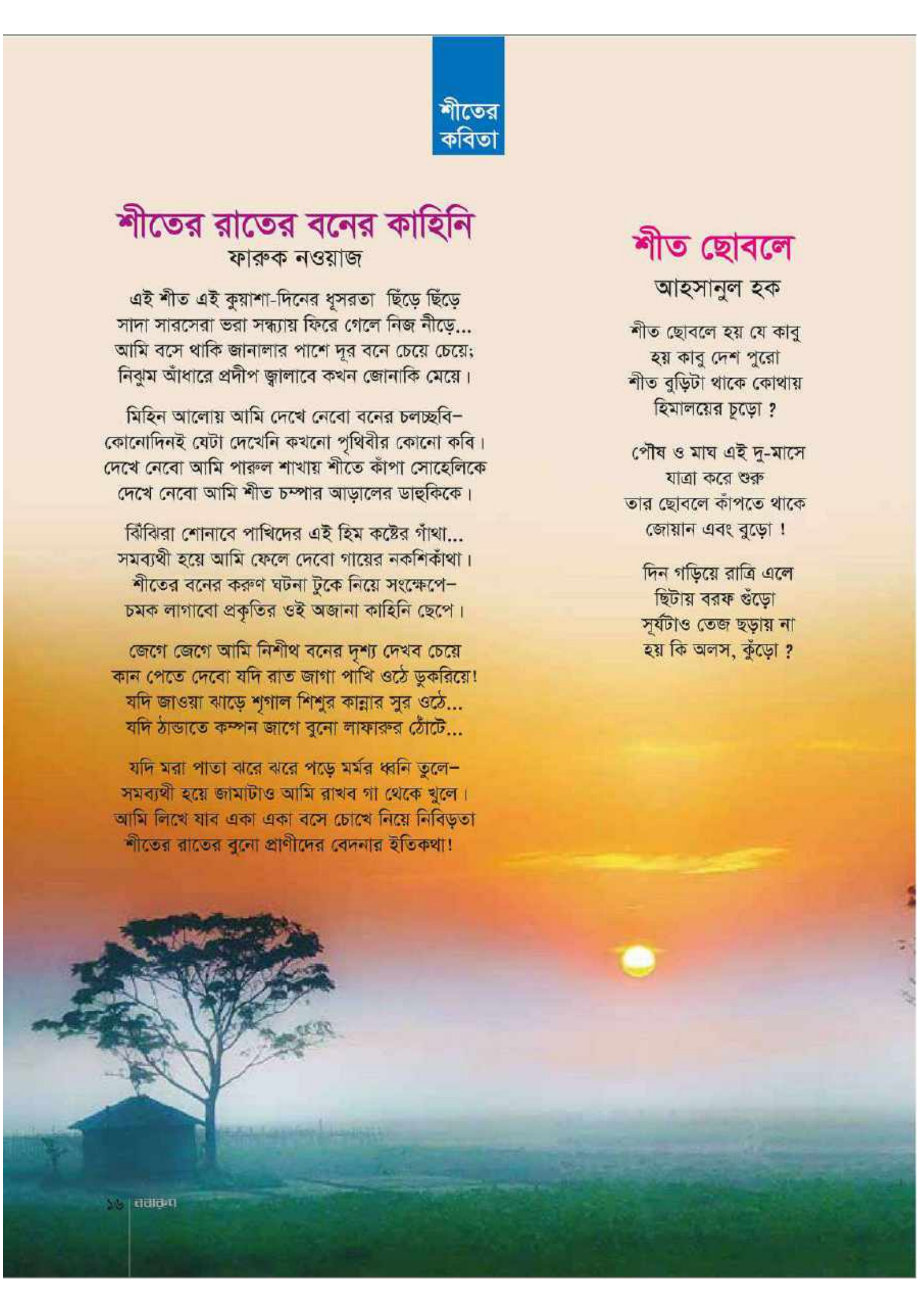

শীতের পিঠা

শাহরিয়ার আলম

শীতকালে পিঠা খেতে
লাগে মজা ভারি
মজার সব পিঠা নিয়ে
চলে কাড়াকাড়ি।
কেউ খায় পাটিসাপটা
আবার কেউ ভাপা
গরম গরম পিঠা খেলে
কমে শীতে কাঁপা।

অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

শিশির ঝরে ঘাসে

ফারুক হাসান

শিশির ঝরে টাপুরটুপুর
ছড়িয়ে আলো হাজার নূপুর
সবাই যখন মগ্ন ওমে
শীতটা ঢোকে আমার রুমে।

ঠক-ঠকা-ঠক কাঁপতে থাকি
সুয্যি মামা দিচ্ছে ফাঁকি
দিনটাকে আজ রাত মনে হয়।

শিশির ঝরে টাপুরটুপুর
গন্ধ বিলায় পৌষালি সুর
শীতটা তো নয় ভয়ের কারণ
বাইরে যেতে তবুও বারণ।

শীতে মনোরম দৃশ্য

বাবুল তালুকদার

শীত বইছে কনকনে বাংলাদেশের বুকে
বৃক্ষকথা জ্বেলে দিয়ে আগুন পোহায় দুঃখে,
দমকা হাওয়ায় কাঁপছে মানুষ থরথর
শীত-কুয়াশায় প্রবীণ মানুষ থাকছে ঘর।

শীতবস্ত্র জড়িয়ে দেহে গরিব-ধনী থাকেন
বাংলা মায়ের আঁচল ঘিরে শিশুদের রাখেন,
শৈশবের দৃশ্যপট অন্তরে আছে গাথা
কত মানুষ কত কিছু করছে ভুল যা তা।

ষড়ঋতুর দেশ আমার সোনার বাংলাদেশ
রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলছে ভুবন জুড়ে বেশ,
শিশির পড়ে শীত-কুয়াশায় পালটে দিলো দৃশ্য
হাসিখুশি প্রকৃতি আজ হয়নি কো ওরা নিঃস্ব।

মা ও শিশুমৃত্যু রোধে অভূতপূর্ব অর্জন

সেলিনা আক্তার

বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু ছিল উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু সরকারের আন্তরিক চেষ্টা এবং নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের ঐকান্তিক শ্রমে সমাধান হয়েছে এই সমস্যার। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, টিকাদানে অভূতপূর্ব অর্জন- সবই সরকারের ও জনগণের কৃতিত্ব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ যেসব সূচকে পিছিয়ে ছিল, ২০১০ সালের পর তা এগিয়েছে কল্পনাতীত ভাবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে শিশুমৃত্যুর হার কামিয়ে আনা। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর অর্জনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১০ জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেন। মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ এই সরকারের সাফল্যের মুকুটে অন্যতম পালক। ২০৩০-এর মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সার্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ (SDG) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। টেকসই অভিষ্ঠের ৩.২

ধারা অনুযায়ী '২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও ৫ বছর বয়সের নীচে শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুনাশ করা' এটি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ও দায়িত্ব পালন করছে। এক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে সচেতন করা। এর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ এবং অংশিদারিত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সৃষ্টি হয়।

৫০ বছরে মা ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে। মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। ধারাবাহিক সাফল্যে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে। ২০১৯ সালের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশের তথ্যমতে, ২০০৪ সালে প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার ছিল ৩ দশমিক ২০ শতাংশ। বর্তমানে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মা ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর কৌশলপত্রের তথ্যমতে, ২০০৯ সালে প্রতি লাখ সন্তান প্রসবে মাতৃমৃত্যু হার ছিল ২৫৯ জন। সম্প্রতি সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬৫ জনে। গত ১০ বছরে মাতৃমৃত্যু হার কমেছে প্রতি লাখ জীবিত জন্মে প্রায় ৯৪ জন। এদিকে শিশুমৃত্যুরহার কমেছে ৮৫ শতাংশ। এই অর্জনে সরকারের কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ আছে। নবজাতক মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে জন্মের সময় শ্বাস গ্রহণে সমস্যা ২৩ শতাংশ, কম ওজনের শিশু ২৮ শতাংশ, সংক্রমণ ৩৬ শতাংশ। কম জন্ম ওজনের শিশুকে পরিপূরক খাবারের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। নবজাতকের শ্বাস গ্রহণে সমস্যা কমাতে 'হেল্পিং বেবিজ ব্রিদ' নামের একটি কর্মসূচি উপজেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রতিটি হাসপাতালের শিশু বিভাগে চালু আছে। পাশাপাশি নবজাতক ইউনিটে ইনকিউবেটর ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মজুদ আছে। সংক্রমণ কমাতে মা ও শিশুকে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় টিটেনাসের টিকা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কম জন্ম ওজনের শিশু যাতে মায়ের সংস্পর্শে তাপমাত্রা ও

বুকের দুধ পায়, সে জন্য প্রতিটি উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে 'ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার' নামে একটি সেবা চালু হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সহায়তা দিচ্ছে ইউনিসেফ। শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছে।

সুস্থ শিশুর জন্ম নিশ্চিতের লক্ষ্যে গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব (গর্ভকালীন), প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিতের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি গর্ভবতী নারীদের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং কোনো জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব প্রসূতিকে জরুরি প্রসূতি সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালনা করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত গ্রামগুলোর মধ্যে থেকে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে 'কমিউনিটি গ্রুপ' তৈরি করা হয়। এই কমিউনিটি গ্রুপ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সমস্ত কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং ৩০ প্রকার ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

টিকাদানের মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় এমন একটি সফল কর্মসূচির নাম হচ্ছে ইপিআই (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি)। এই কর্মসূচির আওতায় ১০টি রোগের বিরুদ্ধে ছয়টি টিকা দেওয়া হয় ০ থেকে ২৩ মাস বয়সি শিশুদের। এ কর্মসূচিতে সহায়তা করছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন। এ কর্মসূচিতে যে রোগগুলোর টিকা দেওয়া হচ্ছে তা হলো-যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, হাম, রুবেলা, পোলিও ও নিউমোনিয়া। এ কর্মসূচির বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয়ভাবে টিকার হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ।

এছাড়া সরকার রোগ নির্মূল ও শিশুমৃত্যু রোধে নির্দিষ্ট সময় পর পর সম্পূরক টিকাদান কর্মসূচি করে থাকে। বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে শতভাগ সফল কর্মসূচির নাম ইপিআই। এ সাফল্যের কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালের মার্চে বাংলাদেশকে পোলিও নির্মূল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভ্যাকসিন হিরো'র অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। পাশাপাশি এ কর্মসূচির আওতায় ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি প্রজননক্ষম নারীদেরও টিটি টিকার পাঁচটি ডোজ দেওয়া হচ্ছে।

২০১৯ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১.৭৩, যা ১৯৯০ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে প্রায় ৬ ছিল। এই মাতৃমৃত্যুর হার কমে আসার পেছনে অনেকগুলো ধাপ আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য

এবং তাদের পুষ্টি পরামর্শ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া সরকারি কেন্দ্রগুলোর একটি বড়ো কাজ।

গত ৫০ বছরে মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে বাংলাদেশের অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। শূন্য থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যু হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যকে ইতোমধ্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) স্বীকৃতি দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের টার্গেট নিয়ে কাজ

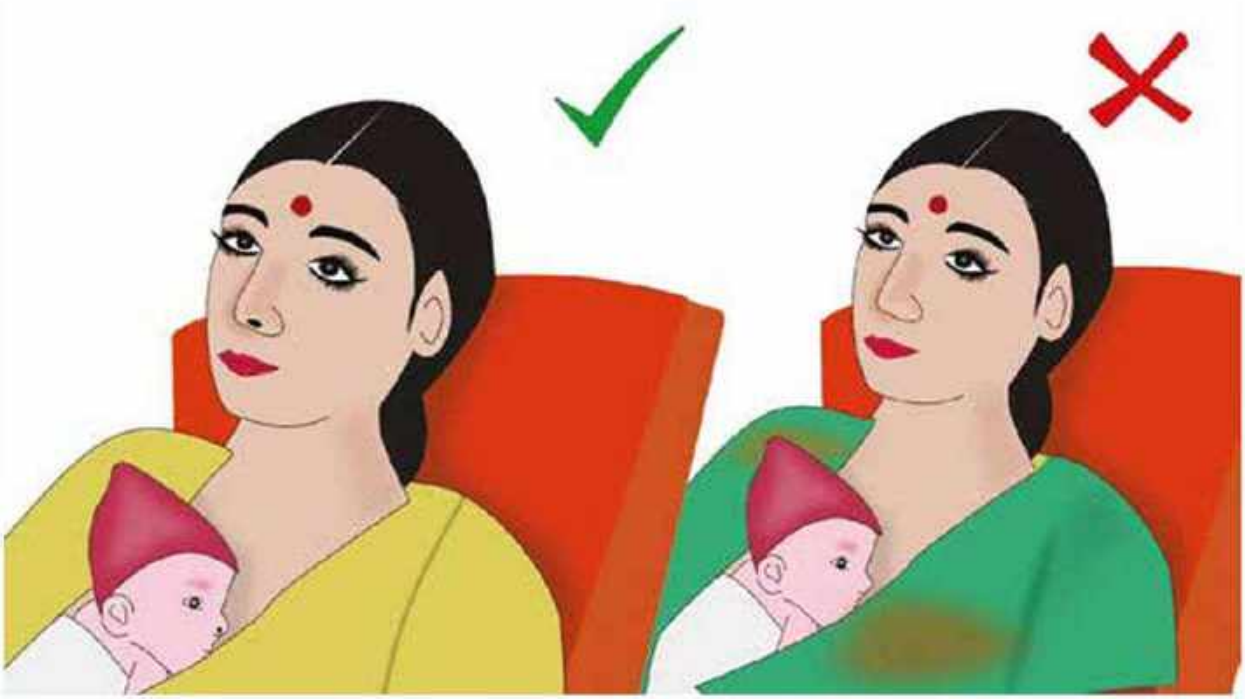

ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার

সংস্থার নির্ধারিত নিয়ম গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা কমপক্ষে চারবার নিতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে জরুরি প্রসূতি সেবার লক্ষ্যে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যায় চিকিৎসকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা ইউনিসেফ ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের সহায়তায় সরকার

পরিচালনা করে থাকে। মাতৃস্বাস্থ্যসেবা সবসময় চালু থাকছে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের কী কী করণীয়

করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ৫০ জনের নীচে নামিয়ে আনা। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে, ১৯৭২ সালে এক হাজার শিশু জন্ম নেয়ার পর বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ১৪১টি শিশু মারা যেত। আর এখন মারা যায় ২১টি শিশু। পাকিস্তানে এখন শিশুমৃত্যুর হার ৫৫। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বছরে সংখ্যাটি ছিল ১৩৯। পাকিস্তানের শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশের চেয়ে কম ছিল। জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন,

স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে দেশের প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য মিলেছে। এক্ষেত্রে মা ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসেও পিছিয়ে নেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভূমিকা রয়েছে দেশের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠকর্মীদের। তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা তৈরি, জরুরি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরামর্শ প্রদান। এছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি অগ্রগতি, নারী শিক্ষার প্রসার, নিরাপদ মাতৃত্ব গ্রহণ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক সন্তান জন্মদান, সন্তান প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, ডায়রিয়াজনিত রোগনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, পুষ্টি কর্মসূচি শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া কৃমিনাশক, ভিটামিন 'এ' কর্মসূচি শিশুদের অবস্থার উন্নতি করেছে।

দেশের সংবিধানে, বিভিন্ন সময়ে নেয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যনীতি এবং সর্বশেষ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচিতে এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়। গত ৫০ বছরে ধারাবাহিককভাবে এসব কাজ হয়ে এসেছে। তার ধারাবাহিকতায় এখনো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একদল দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে মা ও নবজাতকের সবসূচকে বাংলাদেশের উন্নতি ঘটছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন বার্ষিক গ্লোবাল চাইল্ড হুড রিপোর্ট ২০১৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালে গত দুই দশকে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। চারটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছে, যেখানে ভুটানের শিশু মৃত্যুহার কমেছে ৬০ শতাংশ, নেপালে ৫৯ শতাংশ এবং ভারতের ৫৭ শতাংশ। আর বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়েছে ৬৩ শতাংশ। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২৪ বছরে দেশে শিশুমৃত্যুহার ৭৩ শতাংশ কমেছে। এসডিজি অনুযায়ী, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য থেকে এক মাস বয়সি শিশুমৃত্যুহার প্রতিহাজারে ১২ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা ২৮ জন। তবে, শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুহার প্রতিহাজারে ৩৮ জন। এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০৩৫ সালের মধ্যে জীবিত জন্মানো শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২০ জন নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, সরকার মাতৃ ও শিশু মৃত্যুরোধে সকল সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছে। আর এই কারণেই দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু উভয়ই কমেছে। তিনি বলেন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে প্রিম্যাচুউরড-এ শিশুমৃত্যু হারের লক্ষ্যমাত্রা ১২ দেওয়া আছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতের সবাই সঠিকভাবে সঠিক কাজটি করলে এই অপরিণত শিশুমৃত্যুহারের লক্ষ্যমাত্রা আগামী দুই বছরেই অর্জন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে দেশের সব সরকারি হাসপাতালেই গর্ভবতী মায়েদের জন্য ২৪ ঘণ্টা ডেলিভারি সুবিধাও রাখা হয়েছে।

এর সবই বর্তমান সরকারের সাফল্যের গল্প। এতে অবদান রয়েছে গণমানুষের সহযোগী মনোভাবেরও। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূ...র। ■

তথ্য সহকারী, পিআইডি

গল্প

অমিতের রোজগার

শাম্মী তুলতুল

করোনা নামক পৃথিবীর অসুখ সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। করেছে ভয়ভীতিকর জীবনযাপনে ব্যস্ত। তার মধ্যে শিশু-কিশোরদের জীবন হয়েছে কিছুটা অগোছালো। স্কুল, মক্তব অনেক দিন বন্ধ ছিল। এখন যদিও খুলেই তাও সপ্তাহে একদিন। ছোট্ট বন্ধুরা খেলতে গেলে সেখানেও করোনার ভয়। ভুগছে তারা হতাশায়।

দিন দিন মিতুলও হতাশগ্রস্ত হয়ে চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল। মতুলের বন্ধু অমিত মিতুলের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমান। সে মিতুলকে নানা কথা বলে শান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মিতুল স্কুল খুব মিস করে। স্কুলের বন্ধুদের খুব মিস করে। এক সময় স্কুলে যেতে কষ্ট হতো। পড়া ফাঁকি দিতে চাইত। কিন্তু কী এক অসুখ এল তার জন্য সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি মানুষের সাথে মানুষ মিশতেও বারণ।

একদিন অমিত মিতুলের বাসায় মিতুলের সাথে গল্প করতে আসে। গল্প করতে করতে হঠাৎ অমিত বলে, আমি একটা বুদ্ধি বের করেছি শুনবি কি সেটা?

শুনব বল।

আমাদের এই অসুখ তো কখন যায় আমরা কেউ বলতে পারিনা তাই না?

হুম।

আমরা অনলাইনে পড়ার পাশাপাশি একটা কাজ করতে পারি।

কি কাজ?

আমাদের চারপাশে অনেক মাটি আছে। এসব মাটি দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের মাটির খেলনা বানাতে পারি আর সেই খেলনা বিক্রি করতে পারি।

বাহ! দারুন বলেছিসতো।

আর বিক্রির টাকা আমরা বাবাকে- মাকে দিয়ে দিব। তাদেরও উপকার হলো।

খুব ভালো বুদ্ধি বের করেছিস তুই।

কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। ঘরে অভিভাবক, অনলাইনে শিক্ষকরা কি বলে তা মেনে

চলতে হবে। আতঙ্কিত না হয়ে অন্যদেরকেও সচেতন থাকতে বলতে হবে।

হুম ঠিক ঠিক।

চল তাহলে কজ শুরু করে দিই।

আজ?

হ্যাঁ এখুনি। মিতুলের বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত যা মাটি আছে তা ভাগ ভাগ করে পানি দিয়ে মেখে নিল অমিত। এরপর তৈরি করে ফেলল মাটির পুতুল। একে একে বানাল গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, থালা , বাসন আরো অনেক কিছু। মিতুলও তার দেখাদেখি কয়েকটা মাটির খেলনা বানিয়ে ফেলল। এভাবে দুজনে মিলে অনেকগুলো খেলনা তৈরি করে ফেলল। তারপর অমিত একটা বড়ো কাগজ, কলম আর দড়ি আনতে বলল মিতুলকে। মিতুল একটু অবাক হয়ে বলল, এসব দিয়ে কি করবি?

তুই আগে নিয়ে আয় তারপর দেখবি কি করব। মিতুল তার ছবি আঁকার খাতা থেকে একটা বড়ো পৃষ্ঠা ছিড়ে নিয়ে এল। সাথে কলম আর দড়িও। অমিত সেই পৃষ্ঠায় কলম দিয়ে বড়ো অক্ষরে লিখল 'এখানে কম দামে মাটির খেলনা পাওয়া যায়'। মিতুলের চোখ ছানাবড়া। ও ও ও এই কাজ।

হুম এবার বুঝলে। দেখবি আমাদের এমন উদ্যোগ দেখে অন্যরাও এগিয়ে আসবে। চল এটি জানালার বাইরে দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দেই।

অমিত আর মিতুল দুজনে মিলে বড়ো অক্ষরে লিখা কাগজটি জানালার বাইরে টাঙিয়ে দিল। মিতুল বাইরে গিয়ে দেখল রাস্তা থেকে তা ঠিক ঠিক দেখা যায় কিনা। একদম পারফেক্ট হয়েছে লাগানো, মিতুল বলল। কাজ থেকে ফিরে লেখাটি মিতুলের বাবার চোখে পড়লে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে এসব কি বাবা? আমরা করোনার এই সময় লেখাপড়ার পাশাপাশি দুই বন্ধু মিলে আয় করার চেষ্টা করছি বাবা। বন্ধু অমিত এই বুদ্ধি দিয়েছে। আমরা বসে না থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি সহজ কাজও করতে পারি। মিতুলের বাবা তাদের এমন কাজ দেখে খুব আনন্দ পেলেন আর দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।■

অ্যাডভোকেট, চট্টগ্রাম

সায়মা আদিবা আভা, দ্বিতীয় শ্রেণি, আইডিয়াল প্রিপারেটরি অ্যান্ড হাই স্কুল, শেরপুর

গল্প

বেলপত্র বনের পাখিরা

অজিতা মিত্র

ঝিনুক নদীর তীরে ছিল বড়ো এক বন। বনজুড়ে প্রচুর বেলগাছ ছিল বলে পুজোর জন্য বেলপাতা নিতে সবাই সেখানে যেত। গ্রামের লোকেরা অনেক বছরের পুরনো সেই বনের নাম দেয় বেলপত্র বন। বেলগাছ ছাড়াও আম, জাম, কলা, নারকেল, আতা, কাঁঠাল, আমলকী, চালতা, বরই, ডুমুর, তেঁতুল, লটকন, খেজুর আরও কত যে ফলের গাছ সেই বনে ছিল তার হিসাব নেই। গ্রামের মানুষ বেলপত্র বনের ফলমূল, মধু, কাঠ এসব নিতে আসত। গাছের পাকা ফল খেয়ে বনের পশুপাখি সুখে দিন কাটাতো। তবে বেলপত্র বনের বেল পাকলে পাখিদের কিছুই করার ছিল না। কারণ বেলের আবরণ খুব শক্ত বলে পাখিরা ঠোকর দিয়ে তা খেতে পারত না। বেলের স্বাদ কেমন, তা কখনও জানাই হয়নি পাখিদের। এটা নিয়ে তাদের মনে খুব দুঃখ ছিল।

একদিন বড়ো এক বেল গাছের বেল পেকে হলদে রং হয়ে এল। গাছের মগডালে একটি বেলের চকচকে রং দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেলটি ভালোভাবে পেকে গেছে। কুচকুচে কালো এক দাঁড়কাক এসে বেলের গায়ে ঠোকর দিতে শুরু করে। কাকের কাণ্ড দেখে কোকিল হেসেই কুটিকুটি। কাকের সেদিকে কোনো নজর নেই, সে একমনে ঠোকর দিয়েই যাচ্ছে। কোকিল তাকে বলে, 'তুমি খুব বোকা, এমন শক্ত ফল কখনও কি পাখিরা খেতে পারে? তোমার খিদে পেয়ে থাকলে, অন্য কোনো ফল খুঁজে বের করো। বনে বেল গাছ থাকা বা না থাকায় পাখিদের কিছু যায় আসে না। পাখিরা কখনও বেল খায় না, খাওয়ার চেষ্টাও করে না। কোকিলের কথা শুনে কাক কিছুই বলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবারও ঠোকরাতে শুরু করে। আশপাশের অনেক পাখি এসে ভিড় করে সেই বেল গাছে। ফিঙে বলে, কাক, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মিছিমিছি এত কষ্ট করছ কেন? চলো আমরা পেয়ারা পেকেছে কিনা দেখি। কাক জবাব দেয়, পেয়ারা জীবনে অনেক খেয়েছি, সব সময়ই খাই। আজ বেল খাওয়ার দিন, আমাকে জানতেই হবে কেমন স্বাদ পাকা বেলের। আর কিছু না বলে ফিঙে উড়ে যায় পেয়ারা গাছের ডালে। কোকিল তখনও কাকের দিকে তাকিয়ে হাসছে। হঠাৎ কাকের ঠোকরে পাকা বেলটি মগডাল থেকে খসে পড়ে গেল নিচে। অমনি ফেটে দু'ভাগ হয়ে যায় বেল। সাথে সাথে কাক, কোকিল এবং আশপাশের সব পাখি এসে বেল খাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। পেয়ারা ফেলে ফিঙেও ছুটে আসে বেলের স্বাদ নিতে। জীবনে প্রথম বেল খেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে পাখিরা। আর সবার খুশি দেখে দাঁড়কাকের আনন্দ আরও বেড়ে যায়। বেলটা কিন্তু খুব মিষ্টি ছিল খেতে। ■

প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

কুটুস কাটুস বাদাম খাও

আমির খসরু সেলিম

তোমরা বাদাম খেতে পছন্দ করো নিশ্চয়ই? অবশ্যই খাবে। জেনে রাখো, এক কেজি বাদামে এক কেজি গরুর মাংসের চেয়ে বেশি ক্যালোরি ও পুষ্টি আছে। প্রচুর আঁশ, ভিটামিন আর খনিজ থাকার জন্যে বাদাম মানুষকে দ্রুত শক্তি দিতে পারে। বিশ্বজুড়ে সব বয়েসি মানুষ বাদাম পছন্দ করে।

বেশিরভাগ বাদামের খোসার ভেতরে থাকে দুটো বীজ। কোনো কোনোটিতে পাঁচটাও থাকে। বীজ থেকে গাছ এবং তা থেকে বাদাম জন্মাতে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগে। বাদামের জন্ম নিয়ে ছোট্ট একটা গল্প আছে। 'ভোরবেলা ছোট্ট একটি হলদে ফুল ফোটে। দুপুরবেলা পরাগায়ণ হয় আর ফুলটি যায় ঝরে। ফুলটির গোড়া থেকে একটি কাণ্ড জন্মে মাটির নিচে গিয়ে ঢোকে। কাণ্ডটি মাটির নিচে পৌঁছার পর এর ডগায় বাদাম জন্মে।'

৩ হাজার বছরেরও বেশি আগে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম বাদাম থেকে মাখন প্রস্তুত করা হয়েছিল। আজকের দিনে আমরা বাদাম থেকে তৈরি যে মাখন খাই, সেটি তৈরির উপায় প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন সেইন্ট লুইসের এক চিকিৎসক, ১৮৯০ সালে। তার রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করতে গিয়ে এটি উদ্ভাবন করেন তিনি। বাদামকে দারুণ জনপ্রিয় আর প্রয়োজনীয় করে তুলতে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তার নাম জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার। তাকে এক কথায় বলা হয়, 'বাদাম শিল্পের জনক'। বিশ শতকের গোড়ায় টাসকেজি ইনস্টিটিউটে তিনি তাঁর গবেষণা শুরু করেন। বাদামকে ৩০০ ধরনের কাজে ব্যবহারের উপায় আবিষ্কার করেন তিনি। কার্ভার প্রমাণ করেন, শেভিং ক্রিম থেকে শুরু করে পালিশ, সাবান, রং, শ্যাম্পু, ওষুধ, কালি, লিনোলিয়াম, রাবার, কসমেটিকস, ব্লিচ, ওয়াল বোর্ড, কাগজ এমনকি বিস্ফোরক পর্যন্ত হরেকরকম দ্রব্য তৈরিতে বাদামের ব্যবহার সম্ভব।

বাদাম আসলে মটরশুঁটি-কড়াইশুঁটির মতো শিমজাতীয় গাছ। শিম গোত্রের এসব গাছের ফলে খোসা থাকে। আর ওই খোসার ভেতর এক বা একাধিক বীজ হয়। বাদাম বীজের অর্ধেকটাই হচ্ছে তেল। পৃথিবীতে প্রধানত চার জাতের বাদাম হয়, 'রানার, ভার্জিনিয়া, স্প্যানিশ ও ভ্যালেন্সিয়া।' ■

নির্বাহী সম্পাদক, পর্যটন বিচিত্রা

গল্প

খরগোশ ও লোভী শেয়াল

মোস্তাফিজুল হক

দুটো খরগোশের ছানা, খুব তুলতুলে। দেখলেই মায়া লাগবে। কোলে তুলে নিতেও মন চাইবে। একটার নাম মধু। মধুর লোমগুলো ধবধবে সাদা। আরেকটা কালো রঙের। ওটার নাম মিতা। দুইয়ে মিলে মধুমিতা। আহা! কী মজার নাম! ওদের ছোটো ছোটো পা। টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। চপলমতি দুটো ছানা। দারুণ হাসিখুশি।

মধু ও মিতাকে এখন নিজের খাবার নিজেকেই জোগাড় করতে হয়। একদিন ওরা এক বেগুন ক্ষেতে ঢুকে গেল। কচি কচি বেগুন। মনরাঙানো বেগুনের ফুল। জমিটার এক পাশে গাজর বাড়ছে। এত সব দেখে ওরা খুব খুশি। খাবারের অভাব ফুরোল।

তাই ওরা লাফালাফি শুরু করল। সেখান থেকে হঠাৎ এক শেয়াল বেরিয়ে এল। ওদের নাদুসনুদুস মুখের দিকে চেয়ে রইল। শেষে শেয়ালটা বলল,

'এই যে নাদুসনুদুস ছানা

তোমরা হবে আমার খানা!'

মধু ও মিতা খুব ভয় পেল। তবুও মধু সাহস করে বলল,

'গাজর যদি খেতে পারি
মোটা হব তাড়াতাড়ি
মোটা হলেই খেয়ো তবে
খেতে ভারি মজা হবে।'

শেয়াল ভাবল, ঠিক কথাই তো। আর সাতদিন পরেই গাজরগুলো বড়ো হবে। ওরা এসব খেয়ে বেশ নাদুসনুদুস হবে। তাই শেয়াল মধুমিতাকে ছেড়ে দিল। বলল, 'তোদের দশদিন পরে খাব।'

কিছুদিন যেতেই জমির মালিক মুলো চাষ করলেন। লেটুসপাতারও চাষ হলো। পাতাগুলো তখন বেড়ে চলেছে। এদিকে শেয়ালের দেওয়া দশম দিনও এসে গেছে। শেয়ালের সাথে ওদের দেখাও হয়ে গেল। পাজি শেয়াল মধু আর মিতাকে দেখে খুব খুশি হলো। তারপর বলল,

'আহ্ কী মোটা তাজা ছানা
তোদের খেতে নেই তো মানা!'

ভারি বিপদ! এবার মিতা হাসতে হাসতে বলল,

'আমরা খাব লেটুসগুলো
খাব কিছু চায়না মুলো
ওসব যদি খেতেই পারি
মোটাও হব তাড়াতাড়ি
মোটা হলে খেয়ো তবে
খেতে ভারি মজা হবে।'

শেয়াল ভাবল, ঠিক কথাই। তাই এবারও চলে যেতে দিল।

এভাবেই কিছুদিন গত হলো। তবে খরগোশ ছানারা ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল। এভাবে আর কতদিন? একদিন ঠিকই বুড়ো শেয়াল তাদের খেয়ে ফেলবে।

এদিকে বুড়ো শেয়াল দল ছেড়ে এসেছে। খুব লোভ তার। সবাইকে ঠকায়। অথচ তেমন একটা শিকারও করতে পারে না। তাই সবাই দল থেকে বের করে দিয়েছে। সেই থেকে দলছুট। ঠাঁই নিয়েছে পুরনো কবরে। ওটা এক বুড়োর কবর। সেখানেই একা একা ঝিমোয়। বুড়োর নাতির অনেক হাঁস-মুরগি। সুযোগমতো ওগুলোই ধরে ধরে খায়।

বুড়োর নাতিও খুব টেনশনে। 'বেগুন আর গাজর খায় খাক, এভাবে হাঁস-মুরগি ধরে নিলে তো খুবই মুশকিল!'

সবজি বেচাকেনা শেষের পথে। জমিঅলার ভয় বেড়ে গেল। শেয়াল আরো বেশি করে মুরগি ধরে কি না!

পাজি শেয়ালকে ধরতে হবে। চাষি তার ছেলেকে বলল, 'শেয়াল ধরার ফাঁদ পাততে হবে।'

মধু আর মিতা পাশের জমিতে যাবে। ওতে টমেটোর চারা লাগানো হয়েছে। কাঁচাপাকা টসটসে টমেটো খুব মজা! একদম ভিটামিনে ঠাসা! পাকা টমেটো জটিল রোগ সাড়ায়। তবে মধু আর মিতার ভয় কাটে না। শেয়াল বলেছে, 'আর মোটা হতে হবে না। আগামী সোমবার তোদেরকে খেয়ে ফেলব।'

শেয়াল আরও বলেছে, 'সেদিন ভোরে তোরা আমার ঘরে চলে আসবি। ওই যে কবরটা দেখছিস, ওটাই আমার ঘর।'

মধু ও মিতার মন খারাপ। মন ভারী করে আনারস ঝোপে ফিরছিল। এমন সময় তারা চাষির দেখা পেল। চাষি আর তার ছেলে আলাপ করছে। তারা যা যা বলল, মধুমিতা আড়াল থেকে সব শুনল।

মধু বলল, 'বুড়ো শেয়ালের ঘর চিনিয়ে দিতে হবে।' মিতা বলল, 'এটা কঠিন কাজ। মানুষ কি আমাদের ছেড়ে দেবে? হয়ত রেগে যাবে। বলবে, তোরাই জমির ফসল খেয়েছিস।'

তবুও মধু বলল, 'দেখা যাক, কী হয়? আমরা বলব, শেয়ালকে ধরিয়ে দেবো। তাতে হয়ত আমাদের ওপর রাগ থাকবে না।'

পরের দিন মধুমিতা চাষির মুখোমুখি হলো। চাষি ওদের দেখেই বলল, 'তোরাই তবে সবজি সাবাড়

করছিস! শুধু কি খেয়েই সাবাড় ? কেটেও তো শেষ করেছিস। এবার আমিও তোদেরকে ভুনা করব। তারপর মজা করে খাব!'

মধুমিতা খুব বিপদে পড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদু, আমাদেরকে মাফ করে দিন। আমরা তো কয়টা সবজি খেয়েছি। বুড়ো শেয়াল যে মুরগি খায়? ছাগলছানাও খেলো! অতগুলো ডিম পাড়া হাঁসও খেয়ে ফেলল!'

চাষি মনে মনে বলল, 'তাই তো!'

এবার মধু বলল, 'আমরা আপনার দয়া চাই। বুড়ো শেয়াল আমাদেরকেও খেতে চায়। তাই ওটাকে ধরিয়ে দিতে চাই। তাই আপনার কাছে এসেছি।

চাষি মধুর কথায় খুশি হলো। বলল, 'ভালো কথা। যদি তাই হয়, তবে তোমরা আমার অতিথি হয়েই থাকবে।'

অবশেষে সোমবার এল। চাষি দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই তৈরি হলেন। লাঠিসোঁটাও জোগাড় করলেন। লোকজন নিয়ে ফাঁদ পাতলেন। তারপর কবর ঘেরাও করা হলো। খড়ের বিনুনি গাঁথা হলো। ওটা দিয়ে কবরে ধোঁয়া দেওয়া হলো। ধোঁয়া সইতে পারল না বুড়ো শেয়াল। তাই বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর সবাই মিলে বেদম পেটাল।

মধু আর মিতা লোভী শেয়ালের সাজা দেখে খুব খুশি হলো। তবে ওরাও মনে মনে ভাবল, এখানে আর নয়। বেশি লোভ করলে বিপদে পড়তে হয়। চাষি হয়ত আমাদেরকেও ধরে খেয়ে ফেলবে।

আর তাই সেদিনই ওরা দূরের পথে রওনা হলো। চলার পথে কোরাস ধরল,

'বেশি লোভে বিপদ ঘটে,
লোভ তাড়াতে হবেই বটে!
পরের জীবন কঠিন হলে
কার জীবনে সুখটা ফলে?

চলার পথে রাখলে কাঁটা
ফুঁটো হবে নিজের পা-টা,
পরের ভালো বুঝতে হবে
জীবন সুখের হবেই তবে।'■

গল্পকার

গল্প

সত্যবাদী সমির

মমতাজ আহাম্মদ

সমির প্রচুর মিথ্যে কথা বলে। একশটা কথা বললে তার নিরানব্বইটা কথাই থাকে মিথ্যে। বিপদে না পড়লে কখনোই সত্যি কথা বলে না সে। ইশকুলে তার কোনো বন্ধু নেই। থাকার কথাও না। কারণ যে ফুলঝুড়ির মতো মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা ছোটায় তার কি বন্ধু থাকতে পারে?

তবে হঠাৎ করেই তার একজন বন্ধু জুটে গেল। তার নাম কায়েস। সে এই ইশকুলে নতুন ভর্তি হয়েছে। সে যেদিন ইশকুলে ভর্তি হয়েছে সেদিন সে দেরি করে ক্লাসে এসেছে। স্বভাবতই সে সবার পিছনের বেঞ্চে এসে বসল। আর পিছনের বেঞ্চে বসা মানেই সমিরের সাথে বসা। কারণ সমির প্রতিদিন পিছনের বেঞ্চে বসে। তাকে টেনেও কেউ সামনের বেঞ্চে নিয়ে বসাতে পারে না। তো সমিরের সাথে পিছনের বেঞ্চে বসতেই তার সাথে কথা শুরু হলো কায়েসের।

'তোমার নাম কী?' প্রশ্ন করল কায়েস।

'আমার নাম গামা। গামা পালোয়ানের নাম শুনেছিস?'

'শুনেছি।'

'আমি সেই গামা পালোয়ানের ছেলের ঘরের মেয়ের ঘরের নাতির ঘরের নাতি।'

'ও।'

'ও কী? ভাবছিস আমি মিথ্যে বলছি? মোটেই না। আমি সত্যি সত্যি গামা পালোয়ানের নাতি। আর তাছাড়া আমার দাদার দাদা অনেক বছর চীন দেশে ছিলেন। সেখানে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে ছিলেন জানিস?'

'না বললে জানব কী করে?'

'ব্রুস লি।'

'অ্যাঁ!' চমকে ওঠে কায়েস।

'হ্যাঁ।'

'তুমি ক্যারাটে জানো?'

'অবশ্যই। ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার আমি। আমার সাথে কখনো লাগতে আসিস না। এমন আছাড় দিব যে মাথা আউলে যাবে।'

'না না, ঠিক আছে।'

'কী ঠিক আছে? বিশ্বাস হলো না আমার কথা? আচ্ছা টিফিন পিরিয়ডে আসিস, তোর সাথে এক রাউন্ড হয়ে যাবে।'

'না না, আমি মারামারি পছন্দ করি না ভাই।'

'আমাকে ভয় পাচ্ছিস?'

'কেন ভয় পাব? তোমাকে ভয় পাওয়ার কী আছে?'

'কিছু নেই বলছিস? মানুষ আমার ভয়ে কাঁপে আর তুই তো কে। শোন একবারের কথা তোকে বলি। একবার আমি ইশকুলের হিজল গাছের তলায় গিয়েছিলাম ভর সন্ধ্যায়। সেই গাছে ভূত থাকে। তো আমি হিজলতলায় গিয়েছি আর অমনি কে যেন নাঁকি কণ্ঠে বলে উঠল, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মাঁনুষের গঁন্ধ পাঁউ। তোঁকে তোঁ এঁখন আঁমি খাঁব'। তার কথা শুনেই আমি বুঝে ফেললাম যে ওটা একটা ভূত। আমি তার কথা শুনে হা হা হা করে হেসে উঠলাম। তাই দেখে ভূতটা কী যে অবাক হলো। সে বলল, হাঁসো কেঁন? আমি বললাম, বাহ হাসব না, আমি কি হটডগ নাকি বার্গার, যে তুমি আমাকে খাবে? শুনে ভূত বলল, আঁমরা মাঁনুষ খাঁই, ওঁসব খাঁই নাঁ। ব্যাটার কথা শুনে আমার ভারি রাগ হলো। ব্যাটা বলে কী। আমি বললাম, আমি কিন্তু ভূত খাই। শুনে ভূত ব্যাটা খুবই চমকে উঠল। আমি তাকে বললাম, শিগগিরি গাছ থেকে নেমে এসো। আমি এখন তোমাকে খাব। আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। আমার কথা শুনে ভূতটা-ও মারে, বাবারে বলে পালিয়ে গেল। বুঝলি তাহলে, ভূতেরাও আমাকে ভয় পায়।'

'ঠাট্টা করছো?' বলে হাসল কায়েস।

'তুই আমার কী হোসরে যে আমি তোর সাথে ঠাট্টা করতে যাব?'

সমিরকে কায়েসের খুবই ভালো লেগে গেল। তাই সেই দিন থেকেই তার সাথে সমিরের বন্ধুত্ব। কায়েস কিন্তু ভারি ভালো ছেলে। সে 'সদা সত্য কথা বলিব, কখনো মিথ্যে বলিব না,' এই টাইপের ছেলে। সে একশটা কথা বললে তার একশটা কথাই থাকে সত্যি। মিথ্যে সে বলতেই পারে না। তার মুখ দিয়ে আসে না। তাকে কেউ জোর করেও মিথ্যে বলাতে পারে না। সমির আর কায়েস ঠিক যেন দুই মেরুর দুই বাসিন্দা। একজন থাকে আকাশে আর আরেকজন থাকে পাতালে। একজন থাকে অন্ধকারে, আরেকজন থাকে আলোতে।

ওরা যখন একসাথে চলে তখন কায়েস সবসময় সমিরকে বলে, 'তুই আর মিথ্যে বলিস না। মিথ্যে বলা মহাপাপ।'

সমির পালটা তাকে বলে, 'তুই সত্যি কথা বলিস না। সত্য বললে বড়োই বিপদ। আমি সত্যি বলা মোটেই পছন্দ করি না। আসলে আমি সত্যি কথা বলতে পারি না। আমার মুখ দিয়ে আসে না।'

‘এটা কি কখনো হয়? তুই চেষ্টা কর, দেখবি তুইও পারবি। আমাকে দেখ, আমি পারছি না? সত্যি বলায় যে আনন্দ মিথ্যে বলায় তা কি আছে? সত্য মানুষকে সুপথ দেখায় আর মিথ্যে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।’

‘থাক তোকে আর বইয়ের ভাষায় কথা বলতে হবে না। এসব কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ঘরে এই কথা, বাইরে এই কথা, স্যারদের মুখে এই কথা, শেষ পর্যন্ত তোর মুখেও এই কথা। আমি যে কোথায় যাব, বুঝতে পারছি না।’

‘আচ্ছা, তুই না আমার বন্ধু। তুই একটু চেষ্টা করে দেখ সত্যি কথা বলার। ভালো লাগলে বলবি, না লাগলে বলবি না।’

‘আচ্ছা যা, একবার বলব, তাতে চলবে তো?’

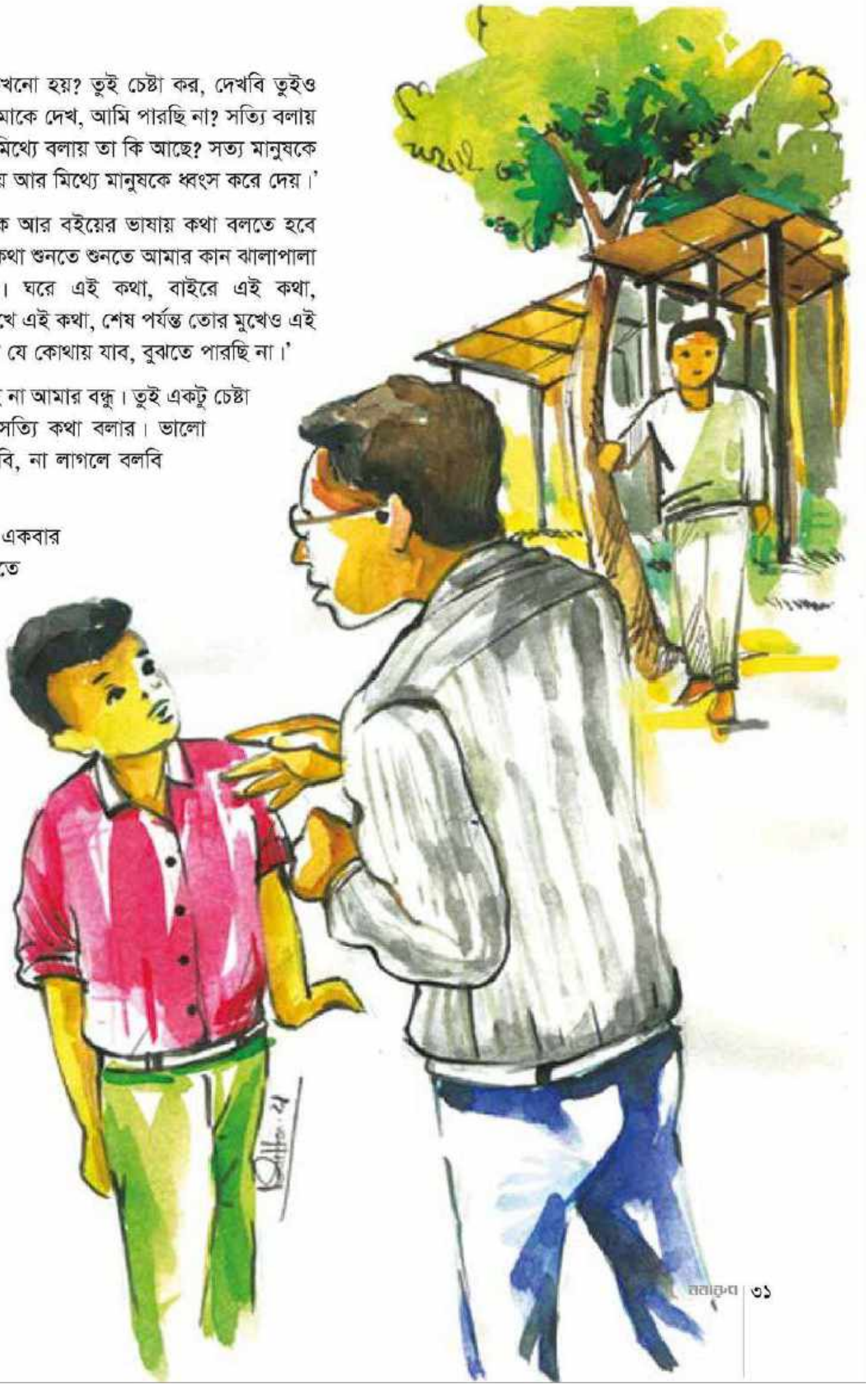

'চলবে। ঐ যে লোকটা হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছে। তার সাথে বলবি।'

'তার সাথে কী কথা বলব?

সে কি আমার সাথে কোনো কথা বলবে?'

'মনে হয়। লোকটা কী যেন খুঁজছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব ঝামেলার মধ্যে আছে।'

'বাপরে, তুই তো মনে হয় তার মনের কথা বুঝে ফেলেছিস।'

ওরা কথা বলতে বলতেই লোকটা হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে ওদের সামনে এসে থামল। 'আচ্ছা খোকা, বলতে পারো সুমনদের বাসা কোনটা?'

'কোন সুমন?'

'এখানে কি অনেক সুমন আছে?'

'আছে কয়েকজন। আপনি কোনজনকে খুঁজছেন?'

'তার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল। বয়স তোমারই মতো। সুমনের ছোটো ভাইয়ের নাম সুজন, আর বড়ো ভাইয়ের নাম সুপন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি ওদের বাসাটা কিন্তু কেউ সঠিক ঠিকানাটা দিতে পারছে না।'

সমির জানে কোনটা সুমনদের বাসা। তার মুখ চুলকাতে লাগল মিথ্যে কথা বলে লোকটাকে একটা হয়রানির মধ্যে ফেলতে কিন্তু কায়েসের সাথে কথা দেওয়ার কথা মনে পড়ে যেতেই সে আর মিথ্যে বলল না। সে হোল্ডিং নম্বরসহ সুমনদের বাড়ির ঠিকানা বলে দিলো লোকটাকে।

'আহ! বাঁচালে আমায় বাবা। সারাটা সকাল এই ঠিকানাটা খুঁজতে কী যে ধকল গেছে, তা আর তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না। আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করো, এই টাকাটা রাখো, দুজনে আইসক্রিম খেও।' বলে পঞ্চাশটা টাকা সমিরের দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা।

'না না টাকা লাগবে না।' প্রতিবাদ করে উঠল কায়েস।

কিন্তু সমির ছোঁ মেরে লোকটার হাত থেকে নিয়ে নিল টাকাটা। 'ধন্যবাদ আপনাকে।'

লোকটা চলে যেতেই কায়েস ফিরল সমিরের দিকে। 'দেখলি তো সত্যি কথার ফল?'

'কিন্তু আমি লোকটাকে ভুল ঠিকানা দিলেও তো তিনি আমাকে টাকা দিতেন।'

'তা দিতেন, কিন্তু সেই টাকাটা নিতে বা খেতে তোর স্বস্তি লাগত না, কিন্তু এখন কেমন স্বস্তি স্বস্তি লাগছে না?'

'হুম, তা অবশ্যি লাগছে।' আমতা আমতা করে বলল সমির। সত্যি সত্যি তার বেশ ভালো লাগছে। এ আনন্দটা অন্য রকম। মিথ্যে বলার আনন্দের চেয়ে এই আনন্দটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে সমিরের।

এরপর থেকে শুরু হলো সমিরের মধ্যে পরিবর্তন। প্রত্যেকদিন সে একটি করে সত্যি কথা বলতে লাগল। ধীরে ধীরে সেটা তার অভ্যাসে পরিণত হলো। মিথ্যে আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। সমিরের এখন মিথ্যে বলতে একদম ভালো লাগে না। একটি মিথ্যে কথা বললে সারাদিন মন খারাপ হয়ে যায় তার। তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে সে। তাকে দিয়ে এখন জোর করেও মিথ্যে কথা বলানো যায় না।

এর ঠিক এক বছর পরের কথা। সমির এখন সত্যবাদী, পুরোপুরি সত্যবাদী। ছোট্ট একটি ঘটনা তার জীবনটাকে পুরো বদলে দিয়েছে। মিথ্যেকে নিক্ষেপ করেছে আস্তাকুঁড়ে আর সত্যকে টেনে নিয়ে এসেছে তার সামনে।

সমির এখন ভালো আছে, খুব ভালো আছে। বন্ধুমহলে এখন সে সত্যবাদী সমির নামে পরিচিত।■

প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

কবিতা ও উপাধির শতবর্ষ

জিয়া উদ্দিন জাহিদ

কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে রচিত এই কবিতার আবেদন আজো ফুরায়নি, রয়ে গেছে আগের মতোই। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার শতবর্ষ পূরণ হলো ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। মাত্র ২২ বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন প্রায় দেড়শ পঙক্তির এই ভুবনবিজয়ী কবিতা। সেনাবাহিনীর থেকে ১৯২০-এর মার্চে কলকাতায় ফেরার পর বিপুল উদ্যমে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে তখন তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন হয়ে এ সময় লিখে ফেলেন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা, গান ও প্রবন্ধ। তবে এ সবকিছুকে ছাড়িয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতায় ঘটেছিল তাঁর কবিত্বশক্তির উপনিবেশবাদের শোষণ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদনাশী এক সুগভীর প্রতিবাদী চেতনা।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতার ৩/৪সি তালতলা লেনের একটি বাড়িতে বসে কাঠ পেনসিলে কবিতাটি লিখেছেন তিনি। কবিতা লেখার পরেরদিন সকালে প্রথম পড়ে শুনিয়েছিলেন ওই বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকা বন্ধু কমরেড মুজ্জফফর আহমেদকে। মুজ্জফফর আহমেদ স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, 'তখন নজরুল আর আমি নীচের তলার পূর্ব দিকের, অর্থাৎ বাড়ির নিচেকার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোন সময়ে তা আমি জানিনে। রাত দশটার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। 'বিদ্রোহী' কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা। আমার মনে হয় নজরুল ইসলাম শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না। তার ঘুম সাধারণত দেরিতেই ভাঙত, আমার মতো তাড়াতাড়ি তার ঘুম ভাঙত না। নজরুলের কিংবা আমার ফাউন্টেন পেন ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তার মাথার সঙ্গে হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেনসিল দিয়ে লিখেছিল।' বিশ্বকবিতার ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা এক অনন্যসাধারণ নির্মাণ। ছাপার তারিখের সাক্ষ্য মতে, 'বিদ্রোহী' প্রথমে মুদ্রিত হয় মোসলেম ভারত

পত্রিকার কার্তিক ১৩২৮ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১) সংখ্যায়। তারপর এটি প্রকাশিত হয় বিজলীতে ২২শে পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (৬ই জানুয়ারি, ১৯২২)। মোসলেম ভারতের প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। কার্তিক সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯২২)। তার আগেই নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়েছে বিজলী পত্রিকায় (২২শে পৌষ ১৩২৮/৬ই জানুয়ারি, ১৯২২)। মজার কথা, কবিতাটির প্রকাশ তথ্য হিসেবে বিজলীতে লেখা হলো যে 'বিদ্রোহী' মোসলেম ভারত থেকে পুনর্মুদ্রিত অথচ মোসলেম ভারত এর সেই সংখ্যা তখন প্রকাশিতই হয়নি। এ তথ্য হয়ত জানা ছিল না বিজলীর কর্তৃপক্ষের। বিদ্রোহী কবিতার জন্য কাগজের চাহিদা এত হয়েছিল যে, সেই সপ্তাহে ওই কাগজটি দুইবার মুদ্রণ করতে হয়েছিল।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় দুজন মানুষ আছেন একজন বক্তা, একজন শ্রোতা। বক্তা তাঁর শ্রোতা কিংবা শিষ্যকে বিদ্রোহব্যঞ্জক কিছু কথা বলতে বলছেন। কিন্তু নজরুলের অসামান্য নির্মাণ কুশলতার পরিণতিতে বক্তা বা শ্রোতা নন, কবি নিজেই হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী। উপাধি পান 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে। একটি কবিতার শিরোনাম একজন কবির নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে এমন ঘটনা বিশ্বকবিতায় দ্বিতীয়টি আছে কি না সন্দেহ। ঔপনিবেশিক শোষণ, মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী রূপে 'বিদ্রোহী' কবিতায় আবির্ভূত হয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য বিদ্রোহী কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরলাম-

বল বীর -
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর -
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর -
আমি চির উন্নত শির!

আমি চিরদূর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড়
অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!
বল বীর -
চির-উন্নত মম শির!...

আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচড় কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি
আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,

আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী,
মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য-করতলে,
তাজী বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল
অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া
দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সন্‌চারি ভুবনে সহসা সন্‌চারি'
ভূমিকম্প।

ধরি বাসুকির ফণা জাপটি' -
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।
আমি দেব শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব মায়ের
অন্‌চল!
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুমঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায়
কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরনীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা-
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের
হাসি!

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল
মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব
সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না -
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না -
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই
পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির
বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো
পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী-বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর -
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির! ■

প্রাবন্ধিক

মুক্তিযোদ্ধের কিশোর উপন্যাস

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর: ষষ্ঠ পর্ব]

বিচ্ছুবাহিনীর প্রথম আঘাত

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, কোথাও দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে থানা-সদরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাজাকারেরা ঘাঁটি গেড়েছে। শহর থেকে আর্মিরা এসে তাদের পনেরো দিনের ট্রেনিং দিয়ে গেছে আর বলে গেছে: ভাইয়ো, ঘাবড়াও মাৎ। হিম্মত রাখো। তোমরা পাক পাকিস্তানের সাচ্চা মুজাহিদ। মুক্তি (মুক্তিযোদ্ধা) দেখলেই মারবে, নয়তো মরবে। মনে রেখো– মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ! এতে রাজাকাররা ভারি উজ্জীবিত। তারা রোজ রোজ মানুষের বাড়ি থেকে গরু-ছাগল ধরে এনে জড়ো করছে ক্যাম্পে। তাদের যুক্তি: গোশত না খেলে রাজাকার জওয়ানরা শক্তি পাবে আর শক্তি না পেলে পাকিস্তানের জন্য লড়বেই বা কীভাবে?

রাজাকারদের এই লুটপাট আর মানুষ হত্যা থামাতেই হবে, ওদের থোঁতা মুখ ভোতা করে দিতে হবে; পাশাপাশি অন্যান্য কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গেরিলা হামলা চালিয়ে শত্রুর মনোবল ভেঙে দিতে হবে– এই পরিকল্পনায় আমরা তখন দু'গ্রুপে ভাগ হয়ে দু'জায়গায় অবস্থান নিয়েছি– এক গ্রুপ আমার নেতৃত্বে রামকান্তপুর গ্রামের ঘন ঝাউবনে; অন্য গ্রুপ সাইদের নেতৃত্বে বিল জলেশ্বরের কোল ঘেঁষা দিয়াড়া গ্রামে। আমাদের গ্রুপের টার্গেট খাজুরা থেকে রতনপুরগামী দুটি আর্মি-গাড়ি, অস্ত্র বোঝাই কাভার্ড-ট্রাক। গাড়ি দুটো খাজুরা থেকে শালবরাটের পুব প্রান্তের একটি কালভার্ট পার হয়ে থানা সদরের দিকে যাবে– এ খবর আমরা আগেই পেয়েছি ইনফর্মারের মাধ্যমে। আমরা এই কালভার্টের নিচে ভোররাতে দুটি ডিনামাইট বেঁধেছি। সকালে অস্ত্র বোঝাই ট্রাক কালভার্টের ওপর উঠলেই শক্তিশালী ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। এখানে একটি কথা বলতেই হয়, তা হলো: আমাদের ঝাউবনের অবস্থানের আশপাশের

বাড়িগুলোর সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। এই গ্রামের বেশ কিছু ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে– আমাদের 'বিচ্ছুবাহিনী'র এক সদস্য তারেকের বাড়ি এ গ্রামেই। সুতরাং আমরা বেশ নিরাপদেই আছি। খাবারেরও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। রাতে শোয়ারও সমস্যা নেই। গ্রামের মানুষেরা অতি গোপনে সব ব্যবস্থা করছে। বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝার উপায় নেই; অথচ ভেতরে ভেতরে গ্রামের সাধারণ মানুষ আমাদের চেয়েও যেন কঠিন যুদ্ধে যোগ দিয়েছে; সে যুদ্ধ আমাদের নিরাপদে আগলে রাখার যুদ্ধ, আমাদের জন্য খাবার ও নিরাপদ আশ্রয় যোগানোর যুদ্ধ এবং কঠিন গোপনীয়তা বজায় রাখার যুদ্ধ। তারা যদি আমাদের আশ্রয় ও খাবার দিয়ে পরম মমতায় আগলে না রাখত কিংবা ওদের কেউ যদি বেইমানি করে আমাদের খবর রাজাকার বা আর্মিদের কাছে জানিয়ে দিত, তা হলে আমাদের কী দশা হতো একবার ভেবে দেখো! কিন্তু তারা তা করেনি বলেই মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামেগঞ্জে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিল। তাই আমার বিবেচনায় এই দরদি মানুষগুলোও একেকজন মুক্তিযোদ্ধা!

ওদিকে দিয়াড়ায় অবস্থানরত সাইদের গ্রুপের কথা একটু বলি। ওরাও সেফ পজিশনে আছে। তার গ্রুপের 'বিচ্ছু' আতিকের বাড়ি এ গ্রামেই। এ গ্রামেরও বেশিরভাগ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। যে দুয়েকজন রাজাকার হয়েছে, তারা সব রাজাকার ক্যাম্পে থাকছে– কেউ রায়পুর, কেউ রতনপুর থানা সদরে। সাইদ গ্রুপের টার্গেট দুটি বড়ো নৌকা, যা দিয়াড়া ও আশপাশের গ্রাম থেকে গরু-ছাগল ও অন্য মালামাল লুটে নেওয়ার কাজে রাজাকারেরা ব্যবহার করবে। ওহ হো, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, দাদুরা। ভারি গুরুত্বপূর্ণ কথা।

– আবারও অন্য প্রসঙ্গ? অন্য দিকে কাট মারার চেষ্টা দাদু? আমি রাগের ভান করে বলি। দাদু তখন বেশ গম্ভীরভাবে বলেন– সত্যি গুরুত্বপূর্ণ– ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। সেটি হলো: মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রতি প্রকৃতির অঢেল দয়া, অনুকম্পা– যা-ই বলো না কেন। সেইবার আমরা নিজের চোখে দেখেছি– প্রকৃতিও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে উদারভাবে। আমাদের যশোরে– বিশেষ করে রতনপুর এলাকায় প্রাকৃতিক বন্যা হওয়ার কথা শোনা যায় না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বছর এই এলাকা বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু সে বন্যা আসল বা প্রাকৃতিক বন্যা নয়; অতি-বর্ষণজনিত বন্যা। প্রচণ্ড একটানা বৃষ্টিতে মে-জুন-জুলাই, এমনকি আগস্ট মাস পর্যন্ত চারদিক টইটম্বুর হয়ে গিয়েছিল– চিত্রা নদী, পাইকপাড়া খাল, বিল জলেশ্বর, ঢেপাই বিল আর বলদেঘাটার খাল থইথই পানিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রা, ঢেপখালি, ঠাকুরকাঠি, চেঁচুয়াখোলা, ভুলবেড়ে কিংবা নোয়াপাড়া-খলসি-শুকদেবনগরের অবস্থাও তেমনি। যার ফলে নৌকা ছাড়া সহজে প্রত্যন্ত গ্রামে যাওয়া যেত না। এতে মুক্তিযোদ্ধাদেরই সুবিধা হয়েছিল বেশি। পাকিস্তানি সৈন্যরা পানি ভয় পেত বলে আমাদের এলাকার জলপ্লাবিত গ্রামেগঞ্জে আসতে পারেনি বা আসেনি। রাজাকারেরা বাঙালি, তারা পানিতে অভ্যস্ত বলে নৌকো নিয়ে তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছে, লুটপাট-অত্যাচার করেছে, নিরীহ মানুষদের ধরে এনে হত্যা করেছে। তবে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় রাজাকারদের ওপর গেরিলা হামলা চালানো শুরু করলে রিমোট এরিয়ায় তাদেরও যাতায়াত অনেক কমে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগও যে কখনো কখনো আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ক'মাস তার বাস্তব প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ও রকম থইথই পানির সমুদ্র না থাকলে রতনপুরের অবস্থা অনেক খারাপ হতো; হানাদারদের আর তার সহযোগীদের হাতে বিরাট গণহত্যা সংঘটিত হতো।

তো দাদুরা, দিয়াড়ায় রাজাকারদের নৌ-টার্গেটে সাইদ গ্রুপের হামলার প্রসঙ্গে এত কথা বললাম। থইথই পানিতে নৌকোয় যাতায়াত সুবিধাজনক বলে থানা সদর থেকে একদল রাজাকার দুটি বড়ো নৌকো নিয়ে বিল-তীরবর্তী প্রত্যন্ত দিয়াড়া গ্রামে লুট করতে যাবে– এ খবর আমরা দু-দিন আগেই পেয়েছি এবং রাজাকারদের আসার আগের দিনই সাইদকে তার গ্রুপসহ দিয়াড়ায় পাঠানো হয়েছে। রাজাকাররা হয়ত ভেবেছে– এত রিমোটে মুক্তিরা এখনো আসেনি, তাই নিরাপদে লুট করা যাবে; আর দু-চারজন জয় বাংলাওয়ালাকে ধরে আনা যাবে কিংবা ওখানেই ফিনিশ করে আসা যাবে।

তো, দিয়াড়ার অপারেশনের পুরোটা পরে বলি, অবশ্য সবটাই সাইদের কাছ থেকে শোনা। তার আগে আমাদের কালভার্ট অপারেশনের কথা শোনো। শালবরাট ও রামকান্তপুর গ্রামের সংযোগস্থলে খালের ওপর কালভার্টটি– বীর মুক্তিযোদ্ধা জুলফিকার আলিদের বাড়ির লাগোয়া। আমরা ডিনামাইটে লম্বা তারের সংযোগ লাগিয়ে বেশ খানিকটা দূরে বাবলা ঝোপে বসে আছি। বাবলা ঝোপ খালের পাড়ে হলেও সেখানেও বন্যার পানি উঠে গেছে। আমরা পানির মধ্যেই বসে আছি। সেখান থেকে কালভার্টের পশ্চিম পাশের রাস্তাটা ভালোভাবে দেখা যায়।

হঠাৎ আশপাশের বাড়ি থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল– সাধারণ ঘেউ ঘেউ নয়; আকাশ-ফাটানো ভয়ার্ত চিৎকার আর করুণ কান্না যেন একসাথে মিশে আছে। এদিকে গাছগাছালিতেও পাখপাখালির এলোমেলো কিচিরমিচির-চেঁচামেচি-চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। তবে কী পশুপাখিরাও হানাদারদের বিপক্ষে? তারা কী আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে? আমরা খেয়াল করে শুনি– কালভার্টের পশ্চিম দিকের বাড়িঘর-গাছগাছালি থেকেও একই রকম ভয়ার্ত শব্দ– কুকুরের কান্না আর পাখিদের ভয়ার্ত কিচিরমিচির ভেসে আসছে। চারদিকে যেন একটা ভয়ের ভাব। আমরা মুহূর্তে সতর্ক হয়ে তাকিয়ে থাকি কালভার্টের পশ্চিম মাথার দিকে। সবার মধ্যে টানটান উত্তেজনা। আমাদের যোদ্ধা জীবনে শত্রুর ওপর প্রথম আঘাত হানার সেই সময়টা যেন অনেক লম্বা মনে হচ্ছে; যেন হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছে আর্মিদের গাড়ি অথবা তারা আসবেই না! এমনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোল খাচ্ছি, এমন সময় শোনা গেল গাড়ির শব্দ– প্রথমে বেশ অস্পষ্ট। একটু পরে আরও স্পষ্ট হলো শব্দ– আরও– আরও। এ সময় কুকুরের চিৎকার আর পাখিদের ভয়ার্ত ডাকাডাকি আরও বেড়ে গেল– তারা বোধ হয় আমাদের শেষবারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছে পরম বন্ধুর মতো! আমরা আরও সতর্ক হলাম। প্রথম গাড়িটা আস্তে আস্তে কালভার্টে উঠে একটু সামনে এগুতেই এবং দ্বিতীয় গাড়িটার সামনের দিকটা কালভার্টে উঠতেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কান ফাটানো শব্দে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ হলো। সাথে সাথে প্রথম গাড়িটা আগুনে জ্বলতে জ্বলতে খেলনা গাড়ির মতো শূন্যে উঠে আবার ঝপ করে পড়ল খালের পানিতে। দ্বিতীয় গাড়িটা কালভার্টের ওপর অর্ধেকটা উঠেছিল। পুরো কালভার্ট ডিনামাইটে ধ্বংস হওয়ায় সামনে খালের পানির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেটাতেও আগুন ধরে গিয়েছিল।

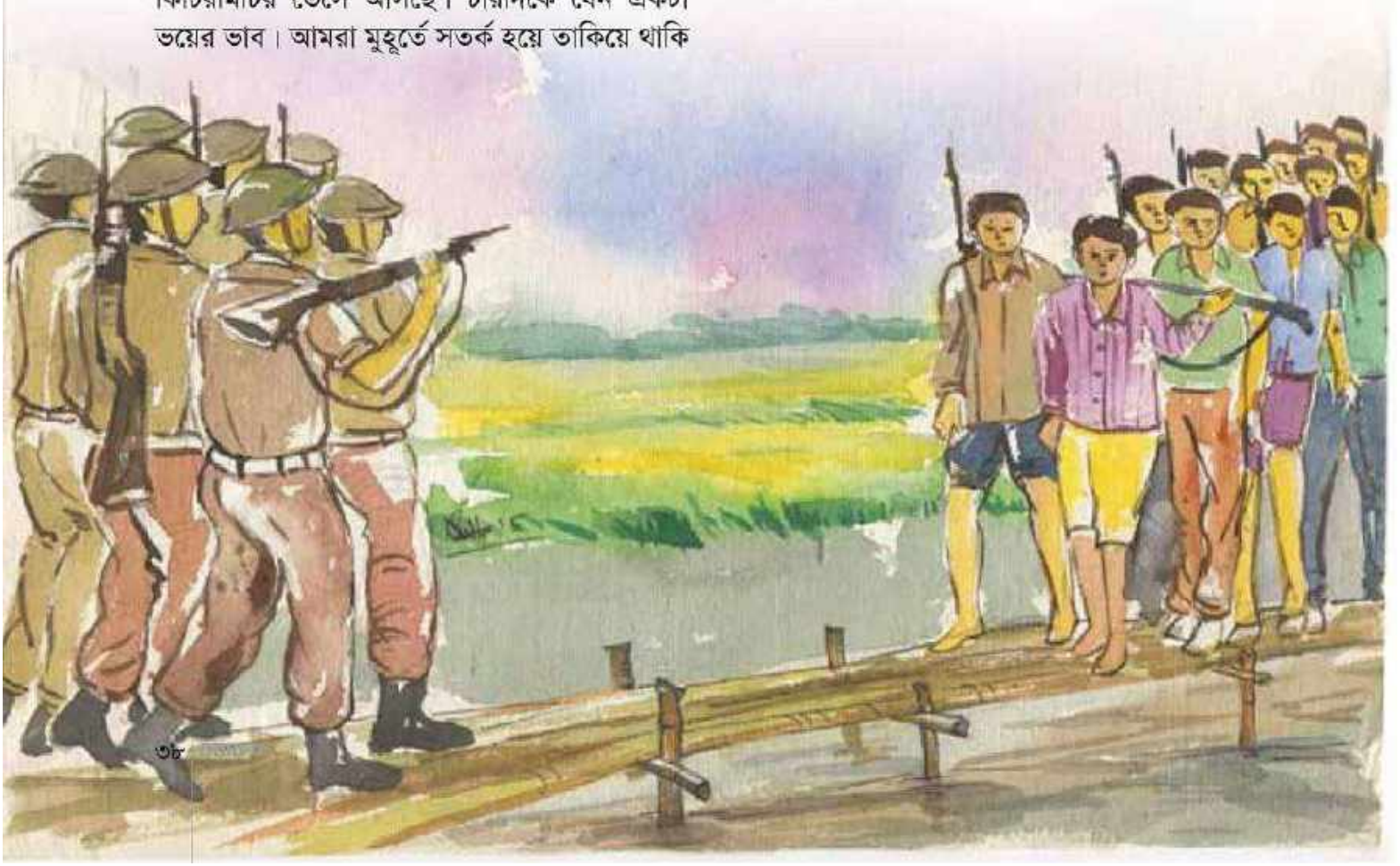

মোসা. জীম, প্রথম শ্রেণি, পাইকগাছা কিন্ডারগার্টেন, খুলনা

গাড়ি দুটোতে ছিল অস্ত্র আর গোলাবারুদ, থানা সদরের রাজাকার ক্যাম্পে সরবরাহের জন্য নেওয়া হচ্ছে। সামরিক ড্রাইভার আর তিনজন করে রাইফেলধারী সৈন্য ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। এই এলাকায় তারা এখনো কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়েনি বলেই হয়ত এমন ঢিলেঢালা ভাব। এই খালটির নাম আতারখাল। এমনিতে সেটি খুব গভীর নয়, কিন্তু বন্যার কারণে ছোট্ট অগভীর খালটি নদীর আকার ধারণ করেছে– পানি হয়েছে অন্তত আট/দশ হাত। পাড় উপচে পানি মানুষের ঘরবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাই অস্ত্রবাহী সামরিক গাড়ি দুটো পুরোটাই পানির নিচে ডুবে গেছে। আমরা কিছুক্ষণ পর বিধ্বস্ত কালভার্টের কাছে যাই। গ্রামের কয়েকজন মানুষ এদিকে আসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা তাদের ইশারায় সরে যেতে বললাম। অবশ্য তারা আমাদের শত্রু নয়– মিত্র; কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তাদের এদিকে আসতে বারণ করলাম। আমাদের চারজন মুক্তিযোদ্ধাকে কিছু দূরে দু-দিকে পাহারায় রাখলাম। আমাদের লক্ষ্য: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া। তবে তার আগে যতটা পারা যায় গাড়ি থেকে অস্ত্র নিতে হবে– বিশেষ করে চাইনিজ রাইফেল আর এলএমজি ও কিছু গুলি।

প্রায় ছয়-সাত মিনিট পার হতেই চার সৈন্যের লাশ– পানিতে ভেসে ওঠে। অন্যরা কোথায় গেল?– কয়েকজন এ প্রশ্ন করতেই আমি বলি– তাদের লাশ গাড়ির মধ্যে আটকে আছে। আমার ধারণা: যারা গাড়ির বাইরের দিকে অস্ত্রের সাথে ছিল, এগুলো তাদেরই লাশ। অন্যরা ড্রাইভারের সাথে গাড়ির মধ্যে থাকায় বেরুতে পারেনি। যাহোক, আমাদের কয়েকজন দ্রুত পানিতে নেমে দুটি গাড়ির বনেটের সাথে মোটা দড়ি বেঁধে আসে। তারপর সবাই মিলে টেনে গাড়ি খানিকটা ওপরে তুলি। খালের টলটলে স্বচ্ছ পানিতে দু'হাত নিচের সবকিছুও স্পষ্ট দেখা যায়। আমার ধারণাই ঠিক– ড্রাইভার এবং তার পাশে বসা সৈনিক কাত হয়ে পড়ে আছে এক দিকে। বেশ আগেই মারা গেছে তারা। গাড়ি আরেকটু টেনে তোলা হলো। তখন ঝটপট কিছু চাইনিজ রাইফেল আর কয়েকটি এলএমজি গাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আমরা ভোগের বিলের দিকে কেটে পড়ি। ওয়াকিটকিতে এ অপারেশনের খবর প্রথমে জমির ভাইকে এবং পরে সাইদকে জানালাম। সাইদকে ভোগের বিলে আমাদের অবস্থানের নির্দেশনা দিলাম। ■ *(চলবে)*

প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

গল্প

কাঠবিড়ালি হলো সুন্দরবনের মন্ত্রী

সাইফুল ইসলাম জুয়েল

সুন্দরবনে আছে সর্বমোট ১১৪ জন রাজা আর রানি। তাদের প্রত্যেকের রাজ্যও আলাদা। একেবারে নির্দিষ্ট সীমানা প্রাচীর দিয়ে ভাগ করা। আজ আমি তোমাদেরকে সেই ১১৪টি রাজ্যের থেকে একটি রাজ্যের গল্প বলব।

রাজ্যটা যেহেতু সুন্দরবনের ভেতরে অবস্থিত, স্বাভাবিকভাবেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মানে বাঘ সেই রাজ্যের রাজা। তোমরা তো জানোই যে, অন্য প্রাণীরা মিলেমিশে থাকলেও, বাঘ সাধারণত একাকী থাকতেই পছন্দ করে। তার রাজ্যে অন্য কোনো বাঘের অণুপ্রবেশ সে একদমই বরদাশত করে না।

তো, হঠাৎ সেই বাঘ রাজার মনে হলো– তার রাজ্যটা ঠিকঠাক চলছে না। আরো উন্নতির দরকার। তিনি সারস পাখির দ্বারা ঘোষণা দিলেন, তার শাসনকার্য সম্পাদনের জন্য রাজ্যে একজন মন্ত্রী নিয়োগ দিবেন তিনি। রাজ্যজুড়ে প্রবল উত্তেজনা। ঘোষণাটা অভাবনীয়। লোভনীয়ও বটে। অনেকেই মন্ত্রী হতে চাইল। কিন্তু, রাজামশাই যে মাত্র একজনকেই নিয়োগ দেবেন...।

একদিন রাজ্যসভায় তিলানাগ ঈগল বলল, 'রাজা মশাই, আমাকে নিয়োগ দিন। আমি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উড়তে পারি। আমার গতি দিয়ে আপনার রাজ্যের সবার অনেক উপকার করতে পারব।'

রাজগোখরা বলল, 'আমি মন্ত্রী হতে চাই। আমার দাঁতে অনেক বিষ, হটিয়ে দেবো সকল দস্যু-দুশমন।'

রাজ কাঁকড়া বলল, 'আমি এদেশের একমাত্র জীবন্ত জীবাশ্ম। আমিই মন্ত্রী হবার যোগ্য।'

বুনো শুকর বলল, 'আমার চোয়ালে হেব্বি জোর। ধরে ফেলব ডাকাত-চোর।'

রানি মৌমাছি বলল, 'রাজামশাই, আমি হতে চাই মন্ত্রী। আমি থাকাতে এ রাজ্যে কোনো মৌয়াল প্রবেশ

করতে পারবে না। সবাই ভাগযোগ করে মধু খাব।'

বড়ো কাছিম বলল, 'আমাকে বানান। মন্ত্রীর আর এমন কী কাজ। শুয়ে-বসে থাকাই তো!'

কিন্তু রাজার চিন্তা দূর হয় না। তিনি রাজ্যের জন্য একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীকে চান, যে রাজ্যটাকে মিলমিশ করে রাখতে পারবে।

হঠাৎ শেয়াল ঘোষণা দিল– তার মতো যোগ্য এই রাজ্যে কেউ নেই। লোকে কী আর এমনি এমনিই তাকে' শেয়াল পণ্ডিত' বলে ডাকে!

শেয়ালের ঘোষণায় লাল বানর, ছোটো ভোঁদর, সজারু, কুমির, চিত্রা হরিণসহ যারাই এতক্ষণ নিজের ব্যাপারে আমতা আমতা করছিল, প্রত্যেকে প্রতিযোগিতা থেকে সরে গেল। ঈগল, চিল, গোখরা, বুনো শুকরসহ অন্যরাও বুঝে গেল শেয়ালের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারবে না।

এবার বোধ হয় শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে শেয়াল পণ্ডিত জিতেই গেল!

রাজা মশাইয়ের মনের দ্বিধা দূর হয় না। মনের মধ্যে কী জানি একটা কাঁটা বিধে আছে তার।

হঠাৎ মঞ্চে আগমন কাঠবিড়ালির। সে ঘোষণা দিয়ে বসল, 'আমি হব সুন্দরবনের মন্ত্রী। আমিই তো সুন্দরমনের যাত্রী।'

রাজা হাফ ছেড়ে বাঁচেন।

শেয়াল বুদ্ধি আঁটে– কী করে কাঠবিড়ালিকে অন্যদের সামনে ছোটো করা যায়।

সে রাজাকে বলে, 'রাজামশাই, কে মন্ত্রী হবার যোগ্য সেটা আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন।'

'উমম, কী পরীক্ষা করা যায় বলো তো?' রাজামশাই নিজেও ভাবনার সাগরে ডুবে যান।

শেয়াল বলে, 'সম্প্রতি এই রাজ্যের প্রাচীন বাসিন্দা মিসেস ক্রোকাডাইলের বিশটি বাচ্চা হয়েছে। তার দশটা বাচ্চা আমার কাছে, আর বাকি দশটা বাচ্চা কাঠবেড়ালির কাছে পড়াশোনা শিখবে। তারপর দেখা যাবে– কার ছাত্ররা বেশি শিখেছে।'

'কিন্তু', রাজা ইতস্তত করে বলেন, 'তুমি তো এর আগে মিসেস ক্রোকাডাইলের দশটা বাচ্চাকে পড়ানোর কথা বলে নিয়ে ন'টাকেই খেয়ে ফেলেছিলে। সেবার সেই বাকি একটা বাচ্চাকেই দশবার দেখিয়ে কুমিরটাকে বোকা বানালে। এবারও বুঝি তেমনই কোনো ধান্দায় আছো?'

শেয়াল জিভ কেটে বলে, 'ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন না... এই আমি তো সেই কবেই বদলে গেছি। বিশ্বাস না-হলে এবার শেষবারের মতো বিশ্বাস করেই দেখুন না।'

উপায়ান্ত না দেখে রাজামশাই তাতেই মত দিলেন।

শেয়ালের বুদ্ধি হলো– সে কাঠবিড়ালির কাছে থাকা দশটা বাচ্চাকেই সুযোগ মতো খেয়ে সাবাড় করবে। আর, নিজের কাছে থাকা বাচ্চাগুলোকে সে সহি-সালামতে রাজামশাইয়ের হাতে তুলে দেবে। এতে তার এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। অনেকদিন ধরে মিসেস ক্রোকাডাইলের বাচ্চাদের ওপরে নজর তার। এটাই সুযোগ। দশ-দশটা বাচ্চা খাবে। কেউ তার দিকে আঙুলও তুলবে না। অন্যদিকে, মন্ত্রীত্ব পাবে, সাথে কাঠবিড়ালিটাকেও রাজ্য ছাড়া করা যাবে!

কাঠবিড়ালি ধুরন্দর শেয়ালের কথায় কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল। আর, পরে তো শেয়ালকে নিজের ছাত্রদেরকে পড়ানো বাদ দিয়ে সারাক্ষণ তার ডেরার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে, সেও এক ভিন্ন পরিকল্পনা করে। শেয়ালের ছাত্রগুলোকে সে সজারুকে বলে সরিয়ে ফেলল, যাতে পাজি শেয়াল ওগুলোকেও খেতে না পারে। আর নিজের ছাত্রদেরকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখল সে। এক্ষেত্রে তার পশু বন্ধুরাও তাকে সাহায্য করল খুব।

শেয়াল পণ্ডিত যখন দেখল– বুমেরাং হয়ে গেছে, অর্থাৎ নিজের কূট বুদ্ধিতে সে নিজেই বিপদে পড়তে চলেছে, তখন বাঘ রাজার কাছে কাঠবিড়ালির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল, 'রাজামশাই, আপনি কাঠবিড়ালিকে উচিত সাজা দিন। সে তার বাচ্চাগুলোকে খেয়ে নিয়ে, এখন আমারগুলোকে কিডন্যাপ করেছে।'

রাজা হেসে বলেন, 'কাঠবিড়ালি কি কুমিরের বাচ্চা খায়?'

শেয়াল থতমত খেয়ে বলে, 'ইয়ে মানে, পাজিটা নিজে খায়নি। ওর বন্ধু চিল, সাপ... এদের দিয়ে খাইয়েছে।'

'তোমার কাছে কোনো সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি?'

'কাঠবিড়ালি সবাইকে ঘুষ দিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছে। আমার পক্ষে আর কে কথা বলবে, বলুন। তবে একজনের কথা বলতে পারি। তার কান্না দেখে আমিও না কেঁদে পারিনি।'

'কে সে?'

'মিসেস ক্রোকাডাইল, হুজুর। বাচ্চাদের শোকে তার সে–কী কান্নাকাটি। ওই কান্না দেখলে পাথরও গলে যাবে। মিসেস ক্রোকাডাইল সেই শোকে এতটাই কাতর যে, এখানেও আসতে পারলেন না। কিন্তু মন গলল না ওই পাজি কাঠবিড়ালি ও তার সঙ্গীদের, দশ-দশটা বাচ্চাকে খেয়ে ফেলল ওরা। ওদের সবাইকে আপনি রাজ্য ছাড়া করুন।'

শেয়ালের এই কথায় কাঠবিড়ালি আঁতকে ওঠে। সত্যিই, এই শেয়াল ব্যাটা মহাধূরন্ধর। মিথ্যের জালে ভালোভাবেই ফাঁসিয়েছে তাকে। এখন বোধ হয় রাজ্যছাড়া হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই রইল না।

কিন্তু ও কি! শেয়ালের কথা শুনে রাজা মশাই যে হো হো করে হেসেই চলেছেন।

'হো হো, হা হা, হি হি।'

তাকে হাসতে দেখে রাজ্যের সকলেই অবাক।

'মহামান্য রাজা, গোস্তাকি নিবেন না, আপনার হঠাৎ কী হলো? আমরা কি রাজবৈদ্য মিস্টার ডলফিনকে খবর দেবো?' বনবিড়াল বলল।

রাজা তার হাত থুড়ি থাবা উচিয়ে বনবিড়ালসহ সবাইকে থামিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন, 'শেয়াল ভেবেছে, কুমিরের মতো আমাকেও বোকা বানাবে! কুমিরের কান্না, কুমিরাশ্রু! হাহা। জানো না– কুমির কখন অন্যদের মতো চোখে কিছু পড়লে বা আবেগের সময় কাঁদে না। ওরা যখন খাবার ধরার জন্য বা শিকার করার জন্য হা করে, তখন ওদের চোখে পানির ফোঁটা দেখা দেয়। তার মানে– এক দিকে চোখের পানি, অন্যদিকে কুমতলব বা শিকারের আকাঙ্ক্ষা। সোজা কথায় অন্য প্রাণীর জীবন নিয়ে খেলা। সে জন্যই তো 'কুমিরের কান্না' কথাটা এখন বাগধারায় পরিণত হয়েছে। যার অর্থ হলো– মায়া কান্না। শেয়াল পণ্ডিত, না জানি তুমি ওই বোকা কুমিরটাকে কী কী ঘুষ দিয়ে হাত করেছ! আর নির্দোষ কাঠবিড়ালিকে ফাঁদে ফেলার জন্য কী সুন্দর চাল তোমার! তোমাকে নির্বাসনে পাঠানো হলো। শিগগির রাজ্য ছেড়ে চলে যাও–'

'এক মাইল দূরে।'

'না, না, দুই মাইল।'

'না, পাঁচ মাইল।'

এতক্ষণে কুমিরের ছানাগুলো বেরিয়ে এসেছে, যারা কাঠবিড়ালির কাছে শিক্ষা নিয়েছে। তারা দশ ভাইবোন, বাকি দশজনকেও শিখিয়েছে।

তারা তাই একেক করে বলে চলেছে–

'না, না, দশ মাইল।'

'না, বিশ মাইল।'

'না, পঞ্চাশ মাইল!'

শেয়াল দৌড়ে চলেছে। দ্রুত। ওদের গোনার সংখ্যা বাড়ার আগে যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে চায় সে। কেননা, হাজার মাইল বললে, অতটা পথ যেতে যেতেই তো সে অক্কা পাবে!

এদিকে রাজা মশাই ভীষণ খুশি। এমন চাতুর্যপূর্ণ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন, পণ্ডিত শিক্ষক সে কি আর পাবে? কাঠবিড়ালিকে রাজ্যের মন্ত্রী বানাতে তার মনে আর কোনো দ্বিধাই রইল না। সাথে সাথেই ঘোষণা দিয়ে দিলেন তিনি। ■

প্রাবন্ধিক

গল্প

তারান্নুমের অপেক্ষা

ইউনুছ আলী

তারান্নুম। আসিফ সাহেবের আদরের ছোটো মেয়ে। বয়স পাঁচ। খুব চটপটে ও সুন্দর। তাকে এ বছর স্কুলে নতুন ভর্তি করা হবে। খুব খুশি সে। বাড়ির একে ওকে জানাচ্ছে তার আনন্দের কথা। আগ্রহের কথা। একদিন খুশির কথা জানিয়ে মাকে বলল, 'আমি এই বছর কোন ক্লাসে ভর্তি হব, মা?'

-প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে। মানে একদম নিচের ক্লাসে।

-কেন মা? খেতে বসলে নিচু চেয়ার, নিচু টেবিল। কথা বললে নিচু গলা, নিচু স্বর। পড়তে বসলে নিচু বেঞ্চ, নিচু ডেস্ক। নিচু সবকিছুতেই নিচু। এবার ক্লাসও নাকি নিচু! কি আশ্চর্য! অথচ ভাইয়াকে দাও উচু চেয়ার। উঁচু টেবিল। উঁচু জুতা। সবকিছুতেই তাকে উঁচুতে রাখো। আচ্ছা, আমার বেলায় এমন করো কেন, মা?

-আরে আমার পাকনা মেয়েরে! বলি, উঁচু টেবিলে বসে পড়তে পারবে? খেতে পারবে? উঁচু কোনোকিছু সহজে ছুঁতে পারবে? না,পারবে না। এজন্যই নিচু খোঁজা। মানে তোমার উপযোগী জিনিসই তোমাকে দেওয়া হয়। বুঝলে? প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসই হচ্ছে তোমার উপযোগী ক্লাস। ইচ্ছেমতো খেলাধুলার ক্লাস। হাবিজাবি আঁকাআঁকির ক্লাস। গানের ক্লাস। নাচের ক্লাস। শুধু মজা আর মজার ক্লাস। ওখানে ডর নেই। ভয় নেই। চাপ নেই। মার নেই। খারাপ কোনোকিছুই নেই।

-তাহলে কত্তো মজা হবে, মা! তুমি যা বললে সবই তো আমার খু-উ-ব ভালো লাগে, মা! নাচ, গান, আঁকিবুঁকি, খেলাধুলা...! আহ কী মজা!

তারান্নুম জেনেছে, জানুয়ারির এক তারিখ স্কুলে বই বিতরণ হবে। হবে বই উৎসব। এদিন সবার হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন বই। সে অপেক্ষা করছে সেই শুভক্ষণের। তারপর বই নিয়ে শুরু হবে ইশকুলে যাওয়া! বাবা কিনে দিবেন নতুন ব্যাগ। বাহ্! কী মজা!! ■

গল্পকার

কেন হাঁটব শিশিরভেজা ঘাসে

রায়হান সাইফুর চৌধুরী

ভোরবেলা শিশিরভেজা ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটা এক আনন্দের ব্যাপার। বন্ধুরা, তোমরা কখনো এমন সুযোগ পেয়েছ। তবে এরপর যখন গ্রামে যাবে অবশ্যই ভোরের শিশিরে হাঁটবে। কারণ ভোরবেলা খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর হাঁটাকে এখন বলা হচ্ছে অন্য রকম ন্যাচারাল থেরাপি। করোনাকালের দুঃসময়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে এ ন্যাচারাল থেরাপির ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী আগ্রহ বেড়েছে বহুগুণে। এখন খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটাকে 'ডিউ ওয়াকিং' নামে অভিহিত করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে এটি এক ধরনের হাইড্রোথেরাপি।

খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসে ভোরবেলা একটু সময় নিয়ে হেঁটে বেড়ালে নানা ধরনের সুফল পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। সবার আগে চলে আসে ভোরের নির্মল দূষণমুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়ার ব্যাপারটি। এতে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা তো বাড়েই, সেই সঙ্গে দেহে রক্ত চলাচলও ভালো হয়। খালি পায়ে ভেজা ঘাসে হাঁটাহাঁটি করলে সারা শরীরে রক্তের পরিসঞ্চালন বাড়ে। চিকিৎসা শাস্ত্র মতে, এই পরিসঞ্চালনের মাধ্যমেই শিশিরে হাঁটা বা ডিউ ওয়াকিং এর সুফলের সূচনা।

পায়ের পাতার কাছের রক্তনালিগুলো ঠান্ডা শিশিরের সংস্পর্শে উদ্দীপিত ও সংকুচিত হয়। এতে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার আশঙ্কায় শরীরের রক্তনালিগুলোতে সার্বিকভাবে রক্তপ্রবাহে জাগে এক চাঙা ভাব, নতুন প্রাণ পায় একঘেয়ে ভাবে চলা হৃদযন্ত্র। এভাবেই এই ডিউ ওয়াকিং আমাদের হৃদরোগ, রক্ত ঘন হয়ে আসার প্রবণতা, রক্তনালিতে চর্বি জমা, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পায়ের পাতায় সরাসরি ভেজা ঘাসের স্পর্শে স্নায়ুতন্ত্র খুবই উপকৃত হয়।

তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোথেরাপির মাধ্যমে আমাদের স্নায়ুগুলো তরতাজা হয়ে ওঠে যখন আমরা ভেজা ঘাসে পা রাখি। আমাদের এই নাগরিক জীবনে বিশাল এক জনগোষ্ঠীর পায়ের পেশি, হাড় ও রক্তনালির বিভিন্ন গুরুতর সমস্যা রয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে এই ডিউ ওয়াকিং বা খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটা খুবই উপকারী বলে প্রমাণিত।

পায়ের রক্তনালির ক্ষীণ পরিসঞ্চালনের জন্য শেষ বয়সে অনেকেই ভেরিকোস ভেইন্স বা ফ্ল্যাট ফুট রোগে ভুগে থাকেন। এর ফলে খুঁড়িয়ে হাঁটেন অনেকেই, পঙ্গু হয়ে যান কেউ কেউ। অথচ সকালে বাইরে গিয়ে শিশির ভেজা ঘাসে হাঁটার অভ্যাস

থাকলে এই ভয়ংকর রোগগুলো থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। ডায়াবেটিসজনিত স্নায়ুতন্ত্রের জড়তাতেও এর কার্যকারিতা পাওয়া যায়।

আবার, অত্যন্ত কষ্টদায়ক মাথাব্যথা মাইগ্রেনের জন্য ডিউ ওয়াকিং নামের এই হাইড্রোথেরাপি খুবই সুফল বয়ে আনতে পারে। এছাড়া এখনো, খুব শক্ত প্রমাণ না পেলেও, বেশির ভাগ গবেষকেরই মতামত হচ্ছে, সবুজ গাছগাছালি, মাঠ, ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে ডিউ ওয়াকিং এর জুড়ি মেলা ভার। একই সঙ্গে মেডিটেশনের মতো প্রশান্তি, মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম, পায়ের আরামদায়ক ম্যাসেজ আর কীসেই বা পাওয়া যায়!

এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ডিউ ওয়াকিং অনেক ভালো কাজ করে। মানসিক কষ্ট এবং অসুখগুলো আমাদের শরীরকেও অসুস্থ করে তোলে। অথচ সকালের সূর্যালোক ভালোভাবে শরীরে পড়লে খুবই কার্যকরভাবে নিঃসৃত হয় আমাদের শরীরের সেরাটোনিন হরমোন, যাকে মানসিক স্বাস্থ্যের ভাষায় 'ফিল গুড হরমোন' বলা হয়।

ভোরের ডিউ ওয়াকিং হয়ত আমাদের অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ওষুধের ওপরে নির্ভরতা অনেকখানি কমিয়ে দিতে পারে।

আমরা অন্তত মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের কথা ভেবে যেন প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে ঘাসে পা রেখে কিছুক্ষণ খালি পায়ে হাঁটি প্রতিদিন। সবুজের সমারোহ, শিশিরের ভেজা সুশীতল অনুভূতি, কোমল ঘাসের স্পর্শ এ সবকিছু আমাদের ক্লান্তি, হতাশা, অবসাদ, বিষাদ আর উদ্বেগকে ঠেলে দিতে পারে বহুদূর। ডিউ ওয়াকিং নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, তাদেরও এই একই অভিমত।

সূত্র:

১. *'ডিউ ওয়াকিং, এ ফরেস্ট বাথিং অ্যান্ড হাইড্রোথেরাপি মাস-আপ', সিন্ডি গিলবার্ট, নেচার থেরাপি চিকিৎসক, সিন্ডিগিলবার্ট ডট সিএ*

২. *'হোয়াট আর দা বেনিফিটও অব সানলাইট', হেলথলাইন ডট কম*

৩. *'সেরাটোনিন ভার্সাস মেলাটোনিন', ক্লে ম্যাকনাইট, লাইভস্ট্রং ডট কম* ■

প্রাবন্ধিক

ইলিশ

শাহরিয়ার শাহাদাত

পদ্মা নদীর ঘোলা পানি
যেই করেছি টাচ
সামনে এল রং রূপালি
একটি ইলিশ মাছ।

বলল ইলিশ- জেলের জালে
কাল পড়েছি আটকা।
পালিয়ে বেঁচে গেলাম আমি
বাঁচেনি পোনা জাটকা।

তোমরা মানুষ এমন কেন
ছোট্ট ইলিশ ধরো
জাটকা ইলিশ ধরতে মানা
নিষেধ থাকার পরও?

দুষ্টু জেলে জাল ছেড়েছে
জাটকা ইলিশ ধরে
পদ্মা বাঁচাও মেঘনা বাঁচাও
যাচ্ছে নদী মরে !

নতুনের গান

মাসুমা জাহান

নতুন বছর নতুন বই
খুশিতে মন তা থৈ তা থৈ
নতুন মলাট নতুন ছন্দ
ভালো লাগে বইয়ের গন্ধ
নতুন ছড়া নতুন গল্প
করব শুরু অল্প অল্প
নতুন ক্লাশ নতুন বন্ধু
গরব মোরা জ্ঞানের সিন্ধু
মনের মাঝে জাগে আশা
নতুন বইয়ের ভালোবাসা
পুরনো সব ভুলে গিয়ে
নতুনের গান গাই।।

একাদশ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আঁকতে পারি

সুবর্ণা দাশ মুনমুন

আঁকতে পারি মেঘলা দুপুর বন জোনাকির আলো
ভাবছো বুঝি, কীসব ছাই আঁকছি অগোছালো?
আঁকতে গেছি মায়ের শাড়ি সবুজ জমিন পাড়ে
লাজুক হেসে লাল রংটাই বসলো চুপিসারে।

আঁকতে পারি সূর্যসেন আর ক্ষুদিরামের মুখ
ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাদের গর্বিত চিবুক।
আঁকছি আমি শেখ মুজিবুর, রবীন্দ্র, নজরুল
প্রীতিলতা বোনটা আমার এঁকেছি নির্ভুল।

জানো না মা একাত্তরের যুদ্ধ আঁকতে গিয়ে
স্বাধীনতা নিলুম কিনে বুকের রক্ত দিয়ে।
ও দুঃখিনী বর্ণমালা আঁকতে পারি তোরেও
প্রভাতফেরির শহিদমিনার ফেব্রুয়ারির ভোরেও।

সবুজ তুলি কাটলো আঁচড় পুবের পাহাড় গায়
দক্ষিণের ওই ফেনিল সাগর ডাক দিল আয় আয়।
আঁকতে আঁকতে রং ফুরাল হয় না আঁকার শেষ
আঁকার খাতা জুড়ে দেখি সোনার বাংলাদেশ।

বাজে তাঁরই গান

প্রত্যয় জসীম

ফুল পাখি প্রজাপতি
তাঁর কথা বলে।
তাঁর ছবি ভেসে ওঠে
ফসল আর ফলে।

নদী জল রোদ মেঘে
তাঁর ছবি ভাসে।
প্রকৃতির বুক জুড়ে
তাঁরই ছবি হাসে।

তিনি কে? মনে রেখো তিনি হলেন...
জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান
লাল-সবুজের বুকে...
আজও বাজে তাঁরই গান।

মহান নেতা

মো. মুনছুর আহমেদ

বিশ্বজুড়ে খ্যাতি তাঁর
নাই যে তাঁর তুলনা
ইতিহাসে অমর তিনি
কেউ কখনো ভুলবে না।

দেশ ও মানুষকে ভালোবেসে
কেটেছে তাঁর সারা জীবন
ধনী-গরিব সবার কাছে
ছিলেন অনেক আপন।

অন্যায়কে দেননি তিনি
কোনো রকম প্রশ্রয়
বিপদে সবাইকে দিয়েছেন
সব রকমের আশ্রয়

অতিথি পাখি

বিচিত্র কুমার

হাজার মাইল পথ পেরিয়ে
এসেছে অতিথি পাখি,
নদী-নালা খাল-বিলে
জুড়াই দুই আঁখি।

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির সারি
নীল আকাশ উড়ে,
ইচ্ছে হলেই ছুটে তারা
আবার অনেক দূরে।

অতিথি পাখির কোলাহলে
সাজে নব প্রকৃতি,
জলাশয়ে বৃদ্ধি পায়
নতুন নতুন অতিথি।

মনের সুখে গায় পাখি
কিচিরমিচির গান,
দুষ্টুলোকে ফন্দি করে
নেয় তাদের প্রাণ।

আমাদের ঋণ

মো. আবির হোসেন

মহান নেতা তিনি
নেই যে তাঁর তুলনা
বাংলাদেশের মানুষ
কখনো তাঁকে ভুলবে না।

সবার মাঝে আছেন তিনি
হয়ে অমলিন
শোধ হবে না কোনোদিন
তাঁর কাছে আমাদের ঋণ।

সপ্তম শ্রেণি, পয়ালগাছা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরুড়া, কুমিল্লা।

খেজুর গাছের কান্না

ফাতেমা বেগম

ছোট্ট বন্ধুরা। তোমাদের একটা গল্প শোনাবো। যা শুনলে তোমাদেরও কষ্ট লাগবে। একটা নদীর কিনারে বড়ো একটা খেজুর গাছ ছিল। এক রাখাল ছেলে তার গরুগুলো মাঠে ছেড়ে সেই খেজুর গাছের নিচে বসল। হঠাৎ তার গায়ে দুই ফোঁটা পানি পড়ল। ছেলেটি উপরে তাকিয়ে দেখে বৃষ্টি নাই কিন্তু পানি আসলো কোথা থেকে। হঠাৎ খেজুর গাছ বলে উঠল, ওটা বৃষ্টি নয় ওটা আমার চোখের পানি। আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন দেখতে খুব সুন্দর ছিলাম। বাতাসের সাথে হেলেদুলে খেলা করতাম। যেই একটু বড়ো হয়েছি হঠাৎ দেখি একটা লোক হাতে দড়ি, ঘটি ও দা নিয়ে গাছে উঠতে শুরু করল তারপর দা দিয়ে আমার গায়ের চামড়া ছিলতে লাগল। তারপর সেখানে মোটা কাঠি ঢুকিয়ে ঘটিটা ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে গেল। আমি সারারাত ঘুমাতে পারিনি। যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। পরদিন খুব ভোরে এসে ঘটিটি খুলে নিয়ে গেল সেই লোকটি। একদিন পরপর আবার এসে চামড়া ছিলে ঘটি লাগাতো আবার ভোরে খুলে নিয়ে যেত। এইভাবে দিনের পরদিন আমার সুন্দর শরীরটা ক্ষতবিক্ষত করে দিলো আমার যখন যন্ত্রণা হয় তখন আমার চোখ থেকে পানি পড়ে। সেই পানি তোমার গায়ে পরেছে। শীত চলে গেলে আমি খুব শান্তিতে ঘুমাতে পারি। ■

শীতের রাতে খেজুর রস

রশীদ এনাম

জাঁকিয়ে বসেছে শীত। শুভ্র কুয়াশার চাদরটা কদিন ধরে সোনা ঝরা রোদকে খুব জ্বালাতন করে চলেছে। নীপবনে রাতে ঝরে পড়া শিশিরবিন্দুগুলো চুপচাপ বসে আছে মুক্তার দানার মতো। একটু পরে সূর্যের আলো আছড়ে পড়বে শিশিরবিন্দুর উপর। শীতের সকালে ঘাসের ডগায় শিশিরকণা আর কাঁচা-মিষ্টি রোদ খেলা করে। ক ক কক ক কক করে হাক তুলছে নানুদের মোরগটা। নানা ভাই শীতের সকালে চাদর জড়িয়ে কাঠের কয়লা মিশ্রিত মাটির সানকির উপর হাত দিয়ে আগুন পোহাচ্ছে। নানা ভাইয়ের পোষা বিড়ালটাও তার কোলে শুয়ে আরাম করছে আর মাঝে মাঝে পা দুটো সামনে টেনে দিয়ে হাই তুলতে ব্যস্ত। নানা বাড়ির পাশে বন্ধু শিবুর বাড়ি। শীত এলেই এমন স্মৃতি মনের কোণে উঁকি দেয়। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে মায়ের সাথে নানা বাড়ি গেলে শিবু আর মামাতো ভাইবোনেরা মিলে খড়ের গাদায় আগুন জ্বালিয়ে শরীর উষ্ণ করতাম। পৌষী সকালে নানির হাতের ধোয়া উঠা গরম গরম ভাপা, চিতই পিঠা দিয়ে খেজুর রস, বিন্নি ভাত আরও কত কিছু দিয়ে শীতের রসনা বিলাস হতো। নানা বাড়ি মানেই আমার কাছে রসের হাড়ি। মিডা মামার সাথে বন্ধু শিবুর ছিল খুব খাতির, একেবারে রঙের বাড়ই বলা যায়। বন্ধু শিবু নাকি মাঝে মাঝে মিডা মামাকে রস, পাটালি গুড়, মোয়া মুড়ি, পুজোর ছাতু, প্রসাদ আরও কত কী খাওয়াতো। বিনিময়ে সে নানা বাড়ির খেজুর গাছে রস গাছি নিয়ে যাওয়ার পর ছোটো ছোটো পট, কৌটা বসিয়ে কিছু ঝাড়া রস সংগ্রহ করত। মাঝে মাঝে নানাদের হাওড়ে জাল পেতে মাছ ধরত। নানা বাড়ি গেলে মিডা মামা, শিবু, মামাতো ভাইবোনেরা মিলে লবণের মাঠে চলে যেতাম। লবণ চাষ কীভাবে করে উপভোগ করতাম। কাদা মিশ্রিত লবণগুলো শাবল দিয়ে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখত। পরে যাতাকলের সাহায্যে খাওয়ার উপযোগী। একবার কাদা মিশ্রিত লবণের মাঠের গভীর গর্তের ভিতর পড়ে গিয়েছিলাম আমি। শিবু আর মিডা মামা আমাকে উদ্ধার করেছিল সেদিন। পুরো শরীর লবণের কাদায় আবৃত। মনে হচ্ছিল যেন আমি এক জীবন্ত মূর্তি।

পৌষের মাঝামাঝিতে নানাদের হাওড়-এ বালি হাঁস, চিঁহিসহ কত নাম না জানা অতিথি পাখি দেখা। খেজুর গাছিরা নানাদের হাওড় থেকে ফাঁদ পেতে অনেক সময় পাখি শিকার করে নিয়ে যেত। অতিথি পাখি শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু গাছি এ কাজ করত সবার চোখের আড়ালে। গাছির নাম ছিল বার্মা হাবিব। শীত মৌসুম এলে তাকে নানা বাড়িতে দেখা যেত। একদিন থাকত গাছির পালা আরেকদিন থাকত নানাদের পালা। যেদিন নানাদের রসের পালা থাকত, সেদিন সে রসে পানি মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করত। একদিন বন্ধু শিবু ও মিডা মামাসহ ফন্দি করলাম, যে করেই হোক, গাছিকে একটা শাস্তি দিতে হবে। সে অতিথি পাখি শিকার করে পরিবেশের ক্ষতি করছে,

আবার রসে পানি মিশাচ্ছে। না এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

তিনজন মিলে ঠিক করলাম, ভোর হওয়ার আগে না হয় গভীর রাতে অপারেশন শুরু করব। শিবু মিডা মামাকে বলল, কীভাবে করবে সে কাহিনিটা একটু শুনি ? মামা বলল, রাতে দেখা যাবে। কথামতো সেদিন গভীর রাতে মিডা মামা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল, কনকনে হাড় কাঁপানো শীতে শরীরের কাঁপুনি, কলা বাদুড়ের ঝাঁপটা, টিনের চালে টুপটাপ ঝড়ে পড়া শিশিরের শব্দ পৌষী রাতের নীরবতাকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে চলেছে। শিবু গুটিগুটি পায়ে কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, খুব সাবধান। শব্দ না হয় যেন। সে দাঁতে দাঁত খিলিয়ে কাঁপছে। কুহেলিকাময় রাতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চানকালী নদীর কেওয়া বন থেকে হুক্কাহুয়া করে হাক তুলছে শিয়ালের দল। ভয়ে গা ছমছম করছে। হঠাৎ নানা ভাই খুক খুক করে কাশি দিয়ে বলল, ঐ মিডা দেখত চিলেকোঠার পাশে কেউ এসেছে কিনা ? পায়ের আওয়াজ শুনতেছি। মিডা বলল, চোর না খেজুর গাছি এসেছে মনে হয়। নানা ভাই ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল। মিডা মামা আর শিবু নিশি রাতে খেজুর গাছে উঠে গেল। বাপরে বাপ কি সাহস ! জ্বিন-ভূতের ডর ভয় ওদের নেই বললেই চলে। কোমড়ের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দুটো কলসি নামাল, খেজুর গাছের কাঁচা রসের মৌ মৌ মিষ্টি গন্ধ অনুভব করলাম। পেঁপে গাছের ডগা দিয়ে গট গট করে, তিনজনে ইচ্ছামতো কাঁচা খেজুরের রস পান করলাম। আহা কি মজা ! মিডা মামা শিবুকে বলল, গাছি যদি বুঝতে পারে কী হবে ? মামা বলল, একটা বুদ্ধি বের করো। আমি বললাম, একটা কাজ কর মামা, কলসির ভিতর পুকুরের পানি ভর্তি করে দাও। শিবু আর আমি কলসিতে পানি দিলাম। হঠাৎ মিডার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল, মাটির কলসিতে কাদা মিশ্রিত লবণ পানি মিশিয়ে দিল। লবণ জল ভর্তি মাটির কলসি খেজুর গাছে ঠিকমতো বসিয়ে দেওয়া হলো। সকালবেলা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম, খেজুর গাছি মাটির কলসি নামিয়ে মুখে দিয়ে রসের স্বাদ পরীক্ষা করছে, আর বলছে আজকাল রসও ভেজাল হয়ে গেছে। মিডা ভালার নাম গন্ধ নেই। রস তো নয় যেন পানসে নুনতা জলের পানি। মিডা মামা আর আমি খিলখিল করে হাসি দিলাম। শিবু বলল, কলা বাদুড় আর রাতের পক্ষিরা রসের হাড়িতে মুখ দিলে খেজুর রস এমনই তো হবে। গাছি বলল ঠিক বলেছেন। তিনজনেই একসাথে হেসে উঠলাম। নানা বাড়ি ছিল সুচক্র দণ্ডি গ্রামের ইন্দ্রপুল এলাকায়, যেখানে তখন শৈষ্ঠ্য বৈদ্য হাট বসত ঠিক তাঁর উল্টা দিকে। কালের বিবর্তনে সেই হাটও এখন আর নেই। নানাদের খেজুর গাছ, সারি সারি নারিকেল গাছ, সবুজ বাগান বাড়ি সবকিছুই আজ বিলুপ্ত হওয়ার পথে। খেজুর গাছিদেরও আজকাল দেখা যায় না। পৌষী রাতের খেজুর রস চুরির কথাটা মনে পড়লে আজও মনে মনে হাসি। ■

লেখক ও প্রাবন্ধিক

গ্রাম আমাদের ভালোবাসার স্থান

রেজা নওফল

শহর আর গ্রাম দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। বন্ধুরা, তোমরা ওয়েবসাইটে সময় কাটাবে না। বরং মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য বিকাশে বিকালে গ্রামের মাঠে খেলবে মজার খেলা। সবুজ প্রান্তরে উড়াবে ঘুড়ি। নদীতে দক্ষ সাঁতারুর মতো সাঁতার কাটবে। মজার সব অর্গানিক খাবার খাবে। শীতে উষ্ণ লেপ মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমাবে। নিজের ল্যাপটপে বসে তৈরি করবে পড়া। নিজেই বানাবে ইলেকট্রিক বিমান। রাতের ধ্রুবতারা দেখে দক্ষ জাহাজের নাবিক হবার স্বপ্ন দেখবে। নিজেই বানাবে বিশ্বের নামকরা সব মঙ্গলকাব্য। বিশ্বের ময়দানে সবগুলো ইভেন্টে জিতবে সোনা। পৃথিবী নামক গ্রহে লাল-সবুজ পতাকায় হলুদ-সোনালি রঙের বাংলাদেশের মানচিত্রটা নিজস্ব জায়গা করে নিবে। আমাদের গ্রামের তৈরি মেঠো গানের সুর সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিবে। গ্রামের ঐতিহ্য আর কৃষ্টি কালচার সৃষ্টি করবে এক সম্ভাবনার দ্বার। ডিজিটাল বিপ্লবে এগিয়ে যাবে অপার সম্ভাবনাময় সোনার বাংলা।

বর্তমান সরকার চেষ্টা করছে সেই পার্থক্যটাকে যত বেশি কমানো যায়। আর এই পার্থক্যটা কমানোর সব থেকে ভালো উপায় হলো প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাকে নিয়ে যাওয়া। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পে একটি সঠিক ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ। সার্ভিস এ্যাট দি ডোর। জনগণ তার হাতের মুঠোয় পেয়ে যাচ্ছে সরকারি সেবা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও অন্যান্য সেবাগুলোকে খুব কাছ থেকে বর্তমান সময়ে সহজেই নিতে পারছে। যার ফলে এখন গ্রামের স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারছে। দেশ সেরা হবার গৌরব অর্জন করছে।

শহরের অধিকাংশ মানুষ কিন্তু এসেছে এই গ্রামীণ জনপদ থেকে। অনেকেই হয়ত বিভিন্ন পেশাগত কারণে বসতি নির্মাণ করেছেন, থিতু হয়ে বসেছেন এই শহরে। কিন্তু গ্রামের আদি রস থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। হয়ত যোগাযোগ নেই সেই ভাবে। কিন্তু মাঝে মাঝে স্মৃতির পাতায় একবার করে হলেও ফিরে যান। হয়ত কখনও মন থেকে বলে ওঠেন, ইশ যদি ফিরে যেতে পারতাম। সেই কারণ আমরা আজ না-ই খুঁজলাম।

সেই গ্রামীণ মেঠোপথ, রেললাইন, পাকা রাস্তা দিয়ে গাড়ির আওয়াজ, কখনো ধুলো উড়িয়ে গবাদি পশুর চলে যাওয়া, দূর থেকে দাঁড়িয়ে ফসলের মাঠে বাতাসের দোল খাওয়া। বুনো পাখির নিশুতি রাতে হঠাৎ করে ডেকে ওঠা। আম-কাঁঠাল দিয়ে মুখ রঙিন করা, পুকুরে সাঁতার, নদীতে খেয়া পারাপার, তপ্ত রোদে নাম না জানা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া। গ্রামীণ হাটের বাজার সদাই। অলস দুপুরের আড্ডা, সুর করে কোরানশরীফ থেকে সুরা পড়ার আওয়াজ, মাটির চুলোয় রান্না। একসাথে সবাই মিলে খাওয়া। গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ছোট্ট সোনামনিদের স্কুলে যাওয়া। কখনো পিঠেপুলি বানানোর আনন্দ উৎসব, সার্কাস, যাত্রাপালা, এলাকার সালিশ ও কোর্টকাছারি। দলবেধে পালা দিয়ে বিলে মাছ ধরা। উঠান সোনালি ধানে ভরা। গরু দিয়ে মলন মলা। রাতে স্কুলের পড়া তৈরি করা। মুখস্থ করা সুর ছড়িয়ে যায় বহুদূরে। জোনাকির উজ্জ্বল আলো। নকশিকাঁথায় গ্রামীণ গল্প। পোষা বিড়ালটার বাড়ির এখানে-ওখানে মিউ মিউ। বিকালে দলবেধে ব্রিজের উপর বসে আড্ডা। শহরে থাকা বন্ধুদের বাড়ি আসার গল্প। ময়রার দোকানের মিষ্টি। নতুন ফোনে ইউটিউবে বিচরণ। ডিজিটাল ঘড়িতে সময় দেখা। ব্লুটুথে কথা বলা। বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে বসে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে যন্ত্রের সাথে কথা বলা।

সম্ভাবনার জায়গা থেকে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা গ্রামীণ বাংলা হয়ে উঠছে সব থেকে আলোকোজ্জ্বল। কৃষক এখন শুধু মাঠে ফসল ফলাচ্ছে না। কৃষি তথ্য বাতায়নের সুযোগে নিজেই তৈরি করছে ফেসবুক লাইক পেইজ। বিক্রি করবে টাটকা ফসল। গ্রামের ছেলেটিই হয়ে উঠছে সফল উদ্যোক্তা। হয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মেধার মূল্যায়ন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা গ্রামীণ সমাজটাকে। পৃথিবী নামক গ্রহে লাল-সবুজ পতাকায় হলুদ-সোনালি রঙের বাংলাদেশের মানচিত্রটা নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের গ্রামের তৈরি মেঠো গানের সুর সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলছে। গ্রামের ঐতিহ্য আর কৃষ্টি কালচার সৃষ্টি করছে এক সম্ভাবনার দ্বার। ডিজিটাল বিপ্লবে এগিয়ে যাবে অপার সম্ভাবনাময় সোনার বাংলা। ■

সাংবাদিক

ছোটো থেকেই শিখতে হবে

আল মামুন

প্রচলিত একটি কথা রয়েছে, 'শিশুরা কাদামাটির মতো'। কথাটি প্রচলিত হলেও এটি শিশুদের বেড়ে ওঠা ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাদামাটিকে যেমনি খুশি যে-কোনো আকার দেয়া সম্ভব তেমনি শিশুকেও কাদামাটির মতো যে-কোনো আদলে বড়ো করা যায়। তাছাড়া শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। শিশুর পরিবারে বা আশপাশে যা কিছু ঘটে সেগুলোর মতো করে সে করার চেষ্টা করে। তাই ছোটোকাল থেকেই শিশুকে মৌলিক কিছু আদব-কায়দা শিখিয়ে দিতে হবে।

যখন থেকে শিশু আপনার কথা বুঝবে তখন থেকেই সে কীভাবে অন্যের সঙ্গে কথা বলবে, কীভাবে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলবে তা শেখাতে হবে। এখানে কিছু বিষয় তুলে ধরলাম।

- ⇨ কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ তাকে ছোটোবেলা থেকেই শেখাতে হবে।
- ⇨ কোনো খারাপ কাজ করলে শিশুকে মারধর বা বকা না দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।
- ⇨ বাড়ির বাইরে গিয়ে শিশু যাতে অন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলতে পারে এমন সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। তাতে সে দুষ্টুমির পথ বেছে নিবে না। তবে অতিরিক্ত দুষ্টুমিকেও প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।
- ⇨ শিশুর দুষ্টুমির জন্য কারো যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শিশুকেও বুঝাতে হবে।
- ⇨ শিশুকে একা না রেখে তার সাথে খোশগল্প করতে হবে। বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেলে অনেকাংশে দুষ্টুমিটা কমে যাবে।
- ⇨ শিশুর কাজের প্রশংসা স্বরূপ তাকে ধন্যবাদ দিতে হবে। এতে সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে।
- ⇨ শিশুকে অতিরিক্ত শাসন না করে গল্পের মাধ্যমে ভালো করে বুঝাতে হবে।
- ⇨ খাবার টেবিলে শিশুকে নিয়ে খেতে বসতে হবে। প্লেটে খাবার দেওয়া মাত্রই যেন খেতে শুরু না করে, সবাই খাওয়া শুরু করলে তখন খাবে এমনই অভ্যাস করুন।

⇨ খাবার ধীরে ধীরে খেতে বলুন এবং খাওয়ার সময় যাতে শব্দ না করে খায় সেটিও বলে দিতে হবে।

⇨ শুরুতে প্লেটে তাকে প্রয়োজন মাফিক খাবার দিন। খাবার যাতে নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

⇨ খাবার শেষ হলে সবাইকে বলে উঠতে শেখান।

⇨ শিশু কোনো ভুল করলে তা স্বীকার করতে শেখান এবং সরি বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

⇨ শিশুর নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে গুছিয়ে রাখে তা সে ব্যাপারে তাকে সচেতন করতে হবে।

⇨ বাসায় কোনো মেহমান এলে শিশুকে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করুন।

⇨ শিশুকে ছোটো থেকেই অভ্যাস করতে হবে কার সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করতে হবে এবং কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর দিতে হবে।

⇨ বাসায় কোনো অতিথি এলে আপ্যায়নের ছোটোখাটো কাজে শিশুকেও সহযোগিতা করতে বলুন। এতে করে সে ছোটোবেলা থেকেই দায়িত্ববান হতে শিখবে।

⇨ কেউ কোনো উপহার দিলে তাকে ধন্যবাদ দিতে যেন ভুলে না যায়।

⇨ কোনো অতিথি বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাকে 'আবার আসবেন' বলতে শেখান। ■

অফিস সহকারী, ডিএফপি

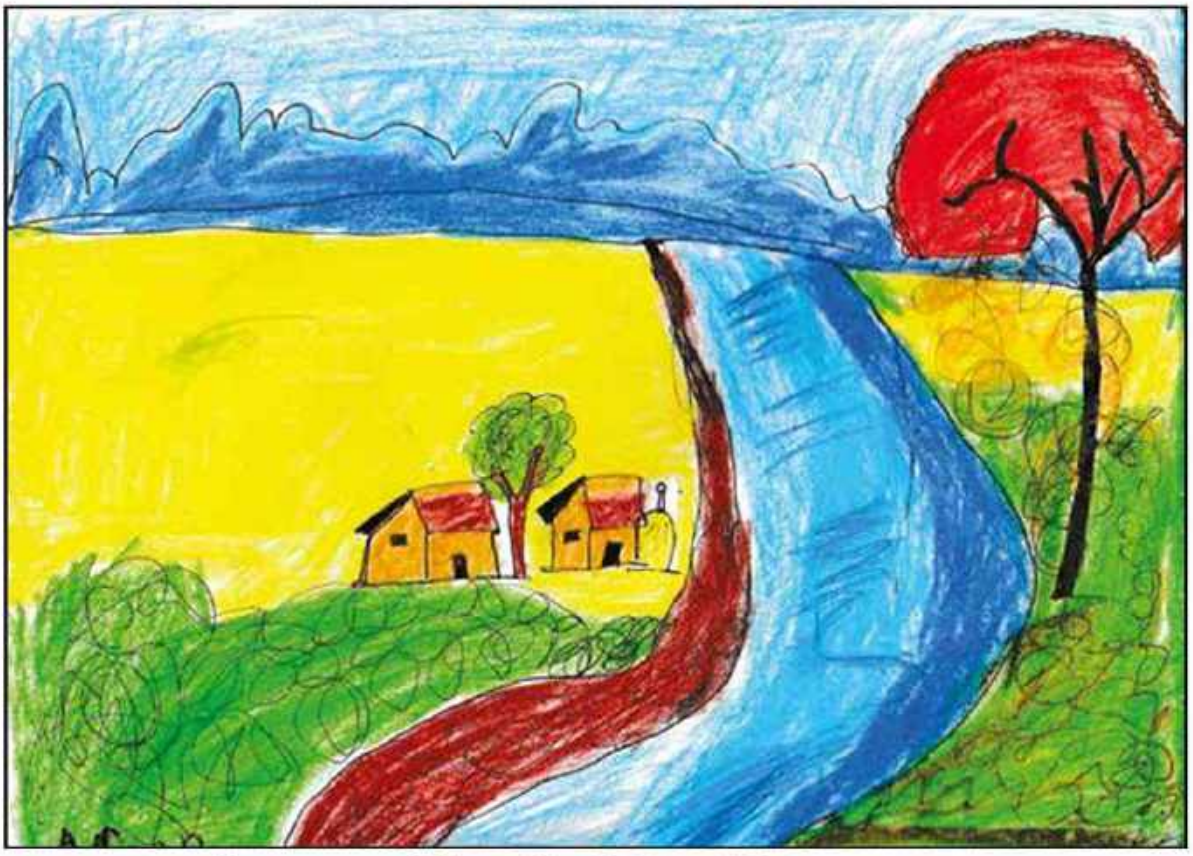

আফনান তারীফ আহমেদ, দ্বিতীয় শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

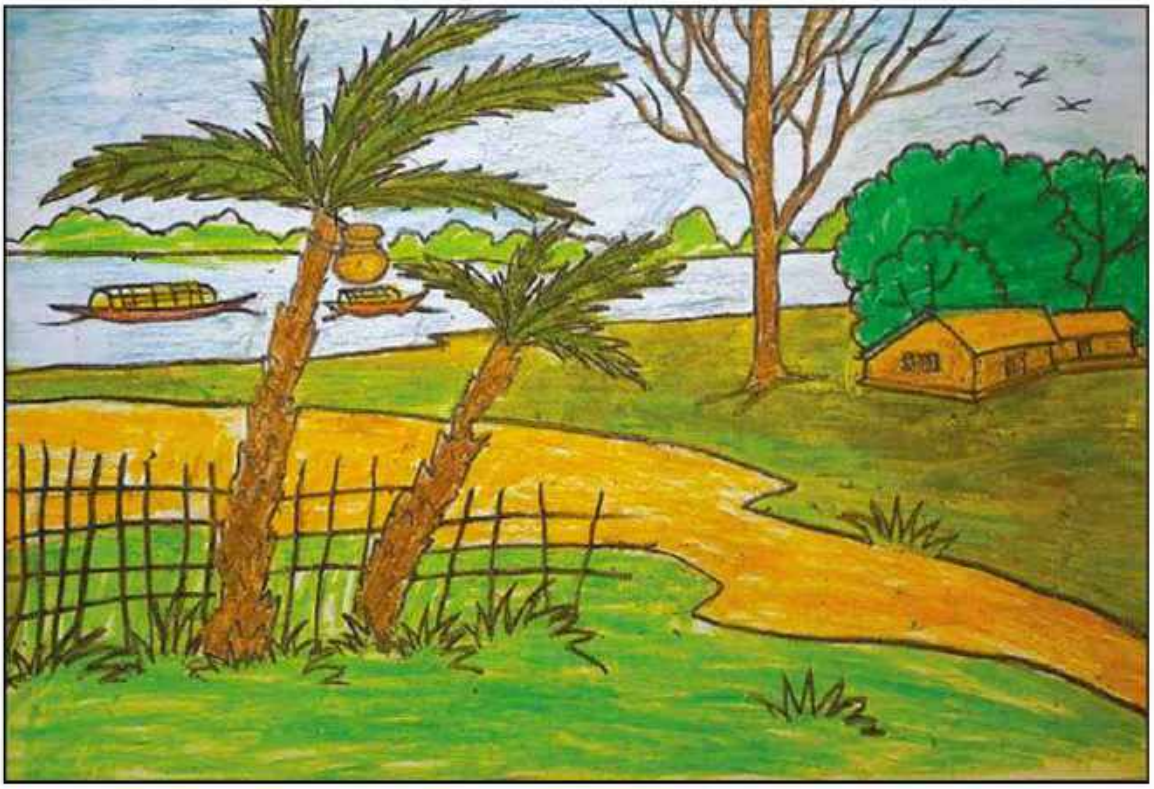

সেঁজুতি শীল, চতুর্থ শ্রেণি, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

নতুন বই

মো. তাফাজ্জল হোসেন

নতুন বই নতুন বই,
ছেলে-মেয়েদের হইচই।
মন মাতানো নতুন বই
কবির কবিতা পড়ছে রই।
নতুন বই হাতে পাওয়া,
শিশু-কিশোরদের আসা যাওয়া।
জমে উঠেছে প্রতিষ্ঠানের আঙিনা।
স্কুলে যাওয়া হবে কোনো বাধা মানব না।
যথা সময়ে বই পেয়ে পড়ছে খুকুরা দিন-রাত,
অভিভাবকরা তাই দেখে হতবাক।
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ব মোরা সবাই
শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, নিরক্ষর যাবে পালাই।

বিচ্ছু

আহনাফ জারীফ আহমেদ

মাথাটা আমার ঘুরে
দুষ্টু বুদ্ধি আমার ঘাড়ে।
আমি যাই না ওর ধারে
তবু আসে বারে বারে।

মরে না জিনের বাচ্চা
কখনো হবে না আচ্ছা।
পড়তো যদি ওর পর বাজ
খুশিতে আমি নাচতাম আজ।

চতুর্থ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বিস্ময় বালক সাদ

মাত্র সাড়ে ৭ বছর বয়সেই রপ্ত করেছে ইংরেজি, সঙ্গে নবম-দশম শ্রেণির অঙ্ক। নিমিষেই করে দিচ্ছে অ্যালজেব্র ও জ্যামিতির জটিল সমাধান। চোখের পলকে কলমের স্পর্শে এঁকে দিচ্ছে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানচিত্র। শুধু তাই নয়, বলতে পারে ইংরেজিতে ওই দেশ সম্পর্কেও। মেধাবী এই বালকের নাম সামিউল আলীম সাদ। ইতোমধ্যে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সবার মুখে মুখে।

সাদের জন্ম ২০১৪ সালের ৬ই জুলাই। বাড়ি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে। বাবা আলি হোসেন আলীম ব্যবসায়ী ও মা আয়েশা আক্তার কলেজের প্রভাষক। দুই সন্তানের মধ্যে সাদ ছোটো। সাদ ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। ইংরেজিতে বলে দিচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে থাকা সব দেশের ভূমি, পাহাড়, পর্বত আর সাগর-মহাসাগরের অবস্থান। পৃথিবীর গঠন-প্রকৃতি, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির বর্ণনা করছে বিশেজ্ঞদের মতো। এই বয়সে সাদের রয়েছে ইউটিউব চ্যানেল। এতে মহাকাশ, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের ৬০টি ভিডিও কনটেন্ট আপলোড করেছে সাদ।

২০২০ সালে উপজেলা শহরের বেসরকারি শিশু একাডেমিতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয় সাদ। কিন্তু করোনা মহামারিতে স্কুলে পড়তে পারেনি। ঘরে বসে মোবাইলে গেম কিংবা কার্টুন দেখে সে। বাবার কাছে বায়না ধরে ল্যাপটপ ও মোবাইলে শিক্ষা বিষয়ক অ্যাপস ডাউনলোড করে দিতে। ছেলের বায়না পূরণ করেন বাবা। শুরু হয় মোবাইলে ও ল্যাপটপে পড়ালেখা। অল্পদিনে রপ্ত করে ইংরেজি। সেই থেকে ইংরেজিতে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সাদ। আমেরিকা ও ব্রিটিশ উচ্চারণে সাদ শুদ্ধভাবে শুধু ইংরেজি বলতে পারদর্শী নয়, লিখতেও পারে। এছাড়াও সাদ নবম-দশম শ্রেণির জটিল অঙ্কের সহজ সমাধানও করতে পারে।

সাদের মেধা নিয়ে তার মা বলেন, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করার পর স্কুল থেকে বই দেয়। সেই বই সাদ তিন দিনে শেষ করে বলে, আব্বা আমার পড়া শেষ। ছেলের কথা শুনে প্রথমে গুরুত্ব দেইনি আমরা। তার মেধা ও বইয়ের পড়া ধরে আমরা অবাক হয়ে যাই। এরপর ছেলে বায়না শুরু করে দ্বিতীয় শ্রেণির বই এনে দিতে। তার বায়নায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি নবম শ্রেণির বই এনে দিলেও সব বই পড়ে শেষ করে ফেলে। কিন্তু তার বেশি আগ্রহ জিওগ্রাফি, গণিত ও জ্যামিতি, স্পেস ও প্লানেটস এবং ফিজিক্স বিষয়ে।■

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

করোনার নতুন ধরন

ছোট্ট বন্ধুরা, এবার তোমাদেরকে নতুন ধরনের করোনার কথা বলব। ইতোমধ্যে তোমরা অনেকেই এই করোনার কথা জানো। সেটা হচ্ছে ওমিক্রন, করোনার নতুন এক ধরন। প্রথম দেখা দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার গুটেং প্রদেশে। এখন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয় বতসোয়ানা, হংকং, ইসরায়েল, বেলজিয়ামসহ বিশ্বের ১০৬টি দেশে পাওয়া গেছে এই ধরনটি। বিশ্ব জুড়েই নতুন ধরনটি নিয়ে বিশাল এক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ধরনটির নাম দিয়েছে ওমিক্রন।

ভাইরাস বদলে ফেলে নিজেকে : আরএনএ ভাইরাসের এক বৈশিষ্ট্য হলো এটি খুব দ্রুত বদলে ফেলে নিজেকে। নতুনভাবে আক্রমণ করার জন্য নতুন কৌশল নিয়ে হাজির হয়। করোনা যেহেতু আরএনএ ভাইরাস সেজন্য এরা প্রতিনিয়ত বদলে ফেলছে নিজেকে।

ভাইরাস যত ছড়াবে ততই বদলে ফেলবে তার চেহারা-চরিত্র। এটাকে বলে মিউটেশন। এই মিউটেশন যত বেশি হবে ততই সম্ভাবনা তৈরি হবে নতুন ভ্যারিয়েন্ট বা ধরন তৈরির। চীনের উহানে প্রাপ্ত বন্য ভ্যারিয়েন্ট নিজেকে বদলে ফেলেছে। সেখান থেকে আমরা দেখেছি আলফা, বিটা, গামা ও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট। এর মাঝে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট তীব্র মাত্রায় ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে বিশ্বকে।

করোনার নতুন চেহারা : ওমিক্রন নামক নতুন ধরনটি অন্তত ৫০টি জায়গায় নিজের রাসায়নিক গঠন বদলে ফেলেছে। ভাইরাসের বাইরের দিকে কদম ফুলের কেশরের মতো যে স্পাইক প্রোটিন রয়েছে সেখানে অন্তত ১০টি পরিবর্তন করে ফেলেছে ভাইরাসটি। মানব কোষের সঙ্গে ভাইরাসের সংযুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে বিশেষ ধরনের প্রোটিনের। নতুন ধরনটির এই বিশেষ প্রোটিনেও পরিবর্তন ধরা পড়েছে। সেজন্য আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ধরনটি দ্রুত মানবদেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আরেকটি ভয়ের জায়গা হলো এই ধরনটি রোগ প্রতিরোধ প্রাচীর টপকে যেতে পারে।

লক্ষণ : নতুন এই ধরনটি নিয়ে এখনও ব্যাপক গবেষণা হয়নি। সুতরাং এটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে এই ধরনটির নতুন দু-একটি লক্ষণের মাঝে তীব্র শরীর ব্যথা, অত্যধিক ক্লান্তি অন্যতম। গলা ব্যথা, শুকনা কাশি, অরুচি এগুলো তো আছেই। তবে নতুন ধরনটির আক্রমণে ঘ্রাণশক্তি উবে যাওয়ার প্রবণতা কম।

করণীয় : স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। বাইরে বেরুলে মেডিক্যাল মাস্ক পরিধান করতে হবে। নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধৌত করতে হবে। জনসমাগম যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। ভ্যাকসিন নিতে হবে। এটি ক্ষেত্রবিশেষে আক্রমণ ঠেকাতে না পারলেও করোনার তীব্র আক্রমণের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করবে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে বিদেশে ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অবশ্যই লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত পরীক্ষা করে নিতে হবে করোনার।■

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিজয়ের এ মাসে দেশবাসীকে দারুণ এক উপহার দিয়েছে আমাদের কিশোরী মেয়েরা। ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ ফুটবলের প্রথম আসরেই অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

আনাইয়ের একমাত্র গোলে ২২শে ডিসেম্বর কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে পড়েছিল উৎসবের রং। সে রং মাঠ ছাড়িয়ে ছড়িয়েছে সারা দেশে।

পুরো টুর্নামেন্টে অপরাজিত বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষের জালে ৫ ম্যাচে দিয়েছে ২০ গোল। রক্ষণ দেয়াল ভেদ করে কোনো গোল ঢোকেনি বাংলাদেশের জালে। কিন্তু ফাইনালে এসে পুরো সময় জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে খেললেও কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পাচ্ছিল না বাংলাদেশের মেয়েরা। খেলার ১৫ মিনিটে গোলের সুযোগ নষ্ট হয় বাংলাদেশের। তহুরার শট গোল লাইনের উপরে আটকে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭৯ মিনিটে বাংলাদেশকে উচ্ছ্বাসে ভাসান আনাই মগিনি। শাহেদার এগিয়ে দেওয়া বলটা পোস্টে শট করে জালে ঢুকিয়ে দেন আনাই। এই গোলের সুবাদে অধিনায়ক মারিয়া মান্দার হাত ধরে বাংলাদেশ হয়ে যায় অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন কক্সবাজারের মেয়ে শাহেদা আক্তার রিপা। তিনি নিজে পুরো টুর্নামেন্টে গোল করেছেন ৫টি আর সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন অনেকগুলো গোল। অসাধারণ দক্ষতায় পুরো মাঠ জুড়ে বিচরণ করেছেন তিনি। তিনি এখন ফুটবল মাঠের জাতীয় হিরো। বিকেএসপি'র দশম শ্রেণির ছাত্রী রিপা ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী।

বয়সভিত্তিক ফুটবলে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ যেন বরাবরই একটু অন্যরকম। এর আগে নয়বার বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ভারতের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। এর মধ্যে পাঁচবারই জিতেছে বাংলাদেশ, বাকি তিনটিতে ড্র করেছে আর একটিতে হেরেছে। এবারের এক টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বেও বাংলাদেশ হারিয়েছে ভারতকে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে এই স্টেডিয়ামেই অর্থ্যাৎ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামেই ভারতকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। ■ *প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী*

সোনার বাংলা গড়ার শপথ

পৌষের মৃদুমন্দ বাতাসে যখন পুব আকাশের সূর্যটা ডুবি ডুবি করছে ঠিক তখনই যেন লাল-সবুজের বর্ণিলচ্ছটায় জ্বলে উঠল পুরো দেশ। বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে একসঙ্গে গর্জে উঠল কোটি মানুষের কণ্ঠের দৃপ্ত শপথ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত-সমৃদ্ধ-অসাম্প্রদায়িক চেতনার 'সোনার বাংলা' গড়তে দৃঢ় প্রত্যয়ে শপথ নিলো পুরো দেশবাসী।

বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে এক মঞ্চ থেকে দেশ গড়ার শপথ পাঠে অংশ নিলো সারা দেশবাসী। সব জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের মানুষ এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে একযোগে শপথ পাঠে বলল, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। বিজয় দিবসে দৃপ্তকণ্ঠে শপথ করছি যে, আজ শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না, দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শে উন্নত-সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলা গড়ে তুলব। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।'

শপথ পাঠের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছোটো বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত 'মহাবিজয়ের মহানায়ক' শিরোনামে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় উপস্থিত হন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ছোটো বোন রেহানাকে পাশে রাখেন।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এ সময় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, আজ ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা

অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দীর্ঘ ২৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের মানুষকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত থাকতে বলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতি জেলা, মহকুমা, থানা ও গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। ডাক দেন অসহযোগ আন্দোলনের। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাংলাদেশের জনগণ এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রিয় দেশবাসী, আসুন আমরা বাংলাদেশের বিজয়ের এই সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিববর্ষে শপথ গ্রহণ করি যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলব, বিশ্বসভায় উন্নত সমৃদ্ধ বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে চলব। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা এখন শপথ গ্রহণ করব। এরপরই শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধানমন্ত্রী। এ সময় সকল মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান তিনি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঞ্চালনায় এ সময় জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, মন্ত্রিসভার সদস্য, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শপথ গ্রহণ করেন। এছাড়াও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে আটটি বিভাগীয় শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেয় এ শপথ অনুষ্ঠানে। ■

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

রুকাইয়া সুলতানা রাহিকা, প্রথম শ্রেণি, লাইসিয়াম কিন্ডারগার্টেন, নাটোর

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়

স্বপ্ন হলো সত্যি, ইতিহাস ধরা দিলো হাতে। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বড়ো বড়ো দলগুলো যেখানে নাকানিচুবানি খায়, সেখানেই ইতিহাস গড়ে জিতল বাংলার দামাল ছেলেরা। সিরিজের প্রথম টেস্টে মাউন্ট মুঙ্গানুইয়ের বে ওভালে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। এটি নিউজিল্যান্ডের মাটিতে যে-কোনো ফরমেট প্রথম জয় টাইগারদের। এরই সাথে ঘরের মাঠে টানা ১৭ টেস্ট অপরাজিত থাকার পর হারের মুখ দেখল কিউইরা। দারুণ এই জয়ে দুই ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও পেল প্রথম পয়েন্টের দেখা।

চতুর্থ দিন শেষেই জয়ের সুবাস পাচ্ছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৪৭ রান নিয়ে দিন শেষ করে নিউজিল্যান্ড। লিড ছিল মাত্র ১৭ রানের। শেষ ৫ উইকেট হাতে থাকলেও বাংলাদেশের বোলাররা কোনোরকম সুযোগই দেননি কিউইদের। দলের ভরসা হয়ে উঠেছিলেন ৩৭ রানে অপরাজিত রস টেলর। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। বর্ষীয়ান এই ব্যাটসম্যান দিনের দ্বিতীয় ওভারেই এবাদত হোসেনের বলে বোল্ড হয়ে ৪০ করে ফিরে যান। সাথে ম্যাচ বাঁচানোর আশাও শেষ হয়ে যায় স্বাগতিকদের। তাসকিন-এবাদতদের তোপে ১৬৯ রানে থামে কিউইদের দ্বিতীয় ইনিংস। এবাদত ৪৬ রানে একাই নেন ৬ উইকেট। ৩৬ রানে ৩টি শিকার তাসকিনের।

বাংলাদেশের জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৪০ রানের। শুরুতেই সাদমান ইসলাম (৩) ফিরে গেলেও মুমিনুল হক আর নাজমুল হাসান শান্তর ব্যাটিংয়ে জয়ের কাছাকাছি চলে আসে টাইগাররা। ৪১ বলে গুরুত্বপূর্ণ ১৭ রান করে শান্ত যখন ফিরছেন, জয়ের জন্য মাত্র ৬ রান দরকার বাংলাদেশের। ৪৪ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে বিজয়ীর বেশেই মাঠ ছেড়েছেন নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়ে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া মুমিনুল হক। ৫ রানে অপরাজিত থাকেন মুশফিকুর রহিম।

ইতিহাস গড়া টেস্টে প্রথম ইনিংসে ডেভন কনওয়ের ১২২ রান সত্ত্বেও ৩২৮ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। জবাবে অধিনায়ক মুমিনুল হকের ৮৮ আর লিটন দাসের ৮৬ রানে ভর করে প্রথম ইনিংসে ৪৫৮ রান তোলে টাইগাররা। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসটাই ব্যবধান গড়ে দিয়েছে দুই দলের। জয় আসে বাংলাদেশের ঘরে। ■

প্রতিবেদন : সানজিদ হোসেন শুভ

দ-শ-দি-গ-ন্ত

বাংলাদেশের বিজ্ঞানীর সাফল্য

পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে সমুদ্রের পানি থেকে নিরাপদ খাবার পানি তৈরি হচ্ছে, কি বিশ্বাস হচ্ছে বন্ধুরা ? কথাটি শুনতে যতটা না সহজ লাগছে বন্ধুরা, কাজটি আসলে ঠিক ততটাই কঠিন। আর এ কঠিন কাজটি সফলভাবে শেষ করেছেন এক বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ও তার গবেষক দল। নাম ড. রাসেল দাশ, তার সহযোগী সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ড. গুরং-শো এবং গবেষক দল। তারা পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করে সমুদ্রের পানি পরিশোধনের ফিল্টার তৈরি করেছেন। এই ফিল্টার দিয়ে ৯৯.৯% সমুদ্রের পানি নির্লবণীকরণ করা সম্ভব। ফলে সাশ্রয়ী ও কম ব্যয়ে সমুদ্রের পানি থেকে নিরাপদ খাবার পানি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। গবেষক দলটি পরিত্যক্ত বোতল থেকে ইলেক্ট্রো-স্পুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এমন এক ন্যানোফাইব্রাস ফিল্টার তৈরি করেছে। সাধারণত এ প্রযুক্তিতে পানি পরিশোধন করা খুবই ব্যয়বহুল। কিন্তু বাংলাদেশি গবেষক দলটি প্লাস্টিকের পরিত্যক্ত বোতল থেকে এমন এক ধরনের পলিমার ব্যবহার করেছেন যা অনেক সাশ্রয়ী এবং এতে পানির মোট পরিশোধন ব্যয় অনেকাংশে কমে যাবে। এই ফিল্টারটি প্রতি স্কয়ার মিটারে প্রতি ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি থেকে প্রায় ২৫ লিটার নিরাপদ খাবার পানি তৈরি করতে সক্ষম। ড. রাসেল দাশ গত আট বছর ধরে মালয়েশিয়া, আমেরিকা এবং জার্মানিতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমুদ্রের পানি পরিশোধন করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। এ ধরনের কাজের জন্য ২০১৫ সালে তিনি 'এলসেভিয়ার-এটলাস অ্যাওয়ার্ড'-লাভ করেন। বর্তমানে তিনি জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপান সরকারের অধীনে পোস্ট ডক্টরাল জেএসপিএস ফেলো হিসেবে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশি কয়েন গার্লের বিশ্বরেকর্ড

একটির ওপর আরেকটি কয়েন রেখে টাওয়ার বানিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন বরিশালের মেয়ে নুসরাত জাহান নিপা। নাম লিখিয়েছেন গিনেস বুকে। ২১শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে গিনেস রেকর্ডের সনদ হাতে পেয়েছেন তিনি। নিপা বরিশাল নগরের দক্ষিণ সাগরদী এলাকার বাসিন্দা। তিনি সরকারি ব্রজমোহন (বিক্রম) কলেজ থেকে রসায়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। ২০১৫ সালে ১ মিনিটে ৬৯টি কয়েন স্তূপ করে টাওয়ারের মতো বানিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখান একজন ইতালিয়ান নাগরিক সালভিয়া সাবা। এরপর সাবার রেকর্ড ভেঙে ১ মিনিটে ৭১টি কয়েনের স্তূপ করে টাওয়ার বানিয়ে গিনেস বুকে নাম লিখিয়ে স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের মেয়ে নিপা।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফফাত আঁখি

সানজিদা আক্তার রূপা, সপ্তম শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ

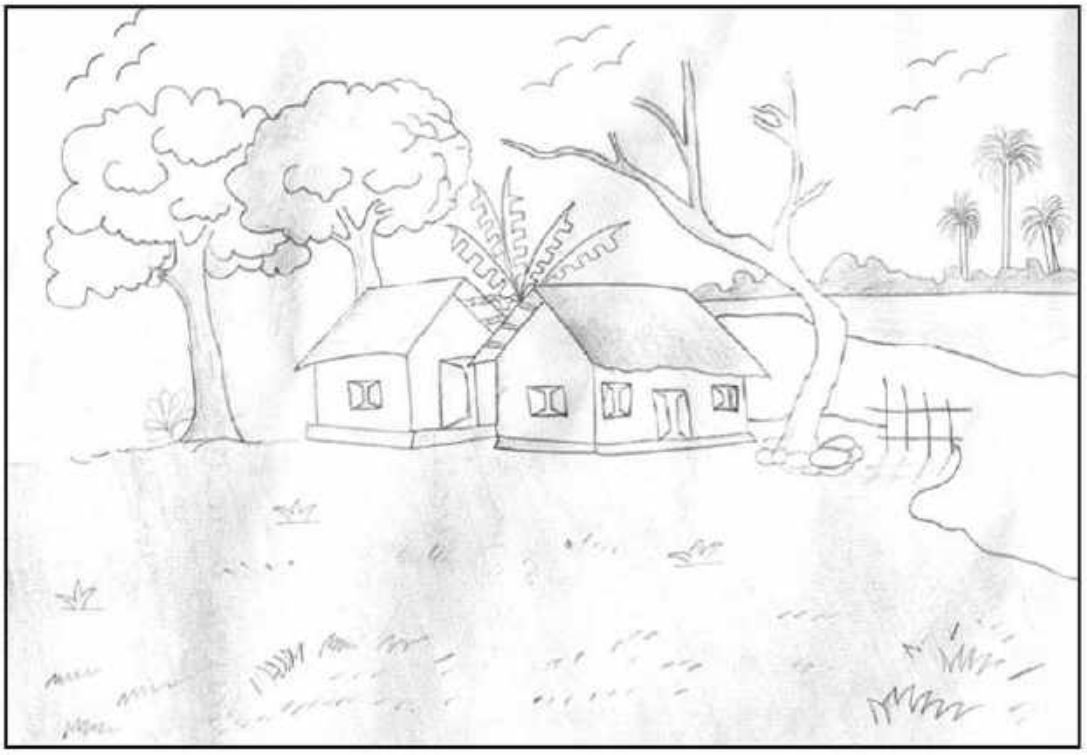

মো. সফিউল আহসান তোহা, দশম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

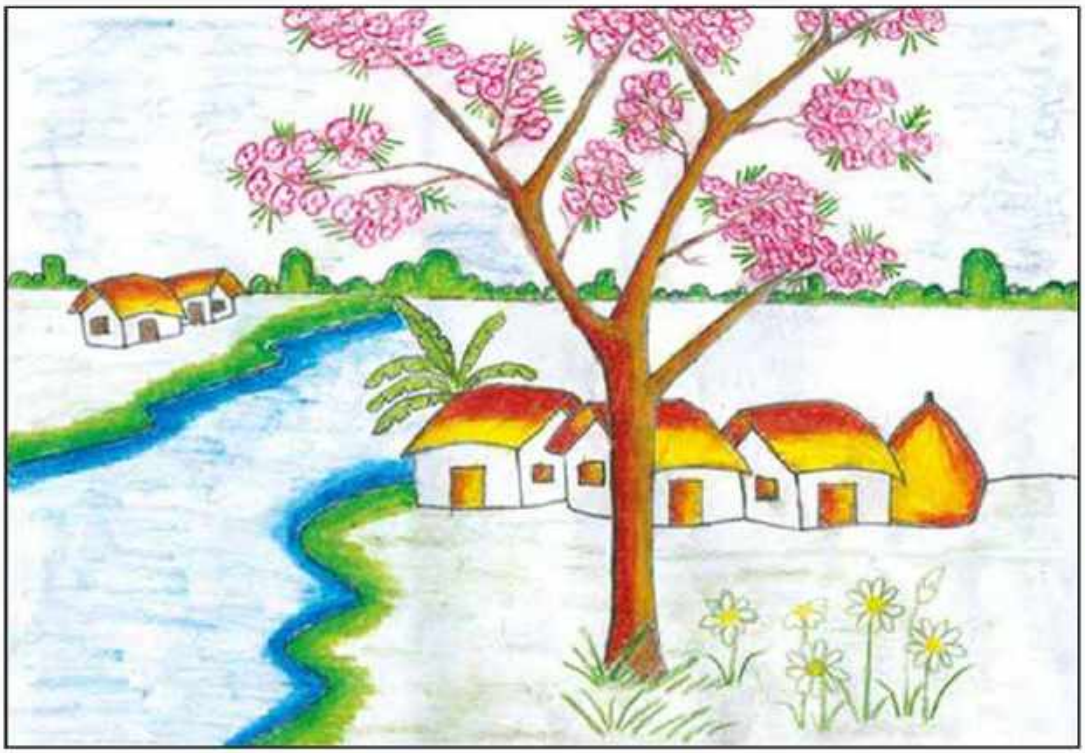

সুমাইয়া আক্তার ওহী, অষ্টম শ্রেণি, মামুদপুর হাজী মোহাম্মদ আলী আইডিয়াল স্কুল, নারায়ণগঞ্জ

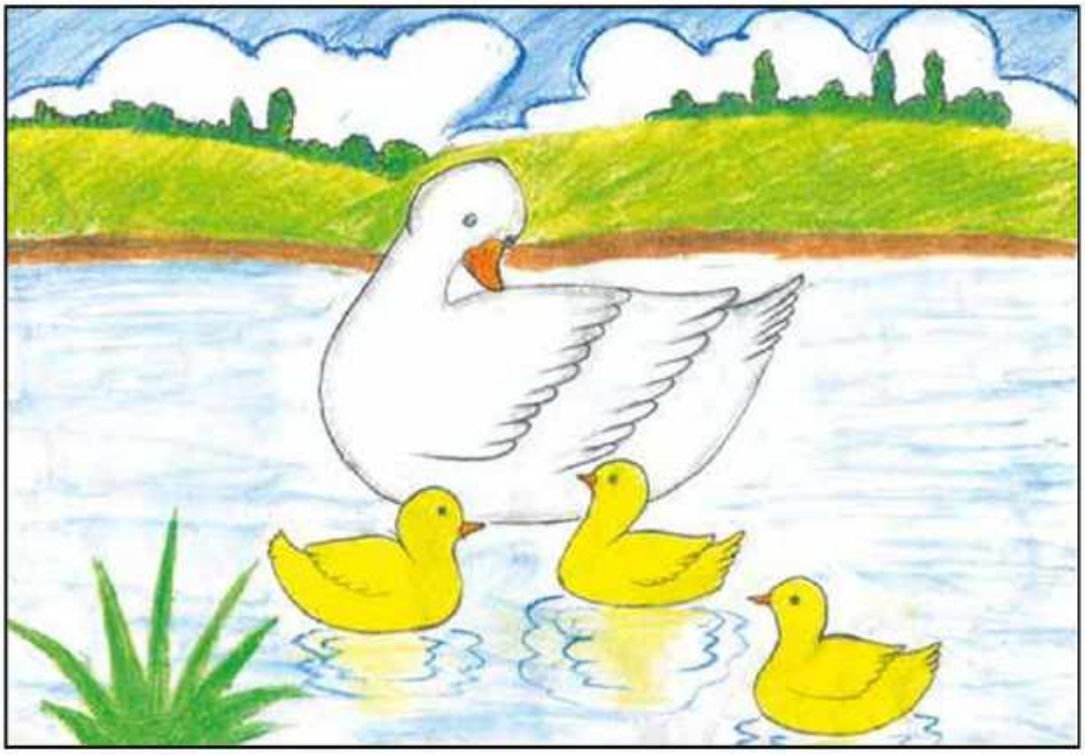

সাবিহা তাসবীহ, সপ্তম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্দেশনা

- শপিং মল ও বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং হোটেল-রেস্তোরাঁসহ জনসমাগমস্থলে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরতে হবে।
- অফিস-আদালতসহ ঘরের বাইরে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়নে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।
- রেস্তোরাঁয় বসে খেতে ও আবাসিক হোটেলে থাকতে অবশ্যই করোনার টিকা সনদ প্রদর্শন করতে হবে।
- ১২ বছরের বেশি বয়সি সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত তারিখের পর টিকার সনদ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।
- স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে স্ক্রিনিংয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পোর্টগুলোতে ক্রুদের জাহাজের বাইরে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও দেশের বাইরে থেকে আগত ট্রাকের সঙ্গে শুধু চালক থাকতে পারবেন। বিদেশগামীদের সঙ্গে আসা দর্শনার্থীদের বিমানবন্দরে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- বিদেশ থেকে আসা যাত্রীসহ সবাইকে বাধ্যতামূলক কোভিড-১৯ টিকার সনদ প্রদর্শন করতে হবে।
- সর্বসাধারণের করোনার টিকা ও বুস্টার ডোজ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রচার ও উদ্যোগ নেবে।
- পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাবেশ বন্ধ রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ও মাস্ক পরার বিষয়ে সব মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবায় ইমামরা সচেতন করবেন।
- কোনো এলাকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-46, No-07, January 2022, Tk-20.00

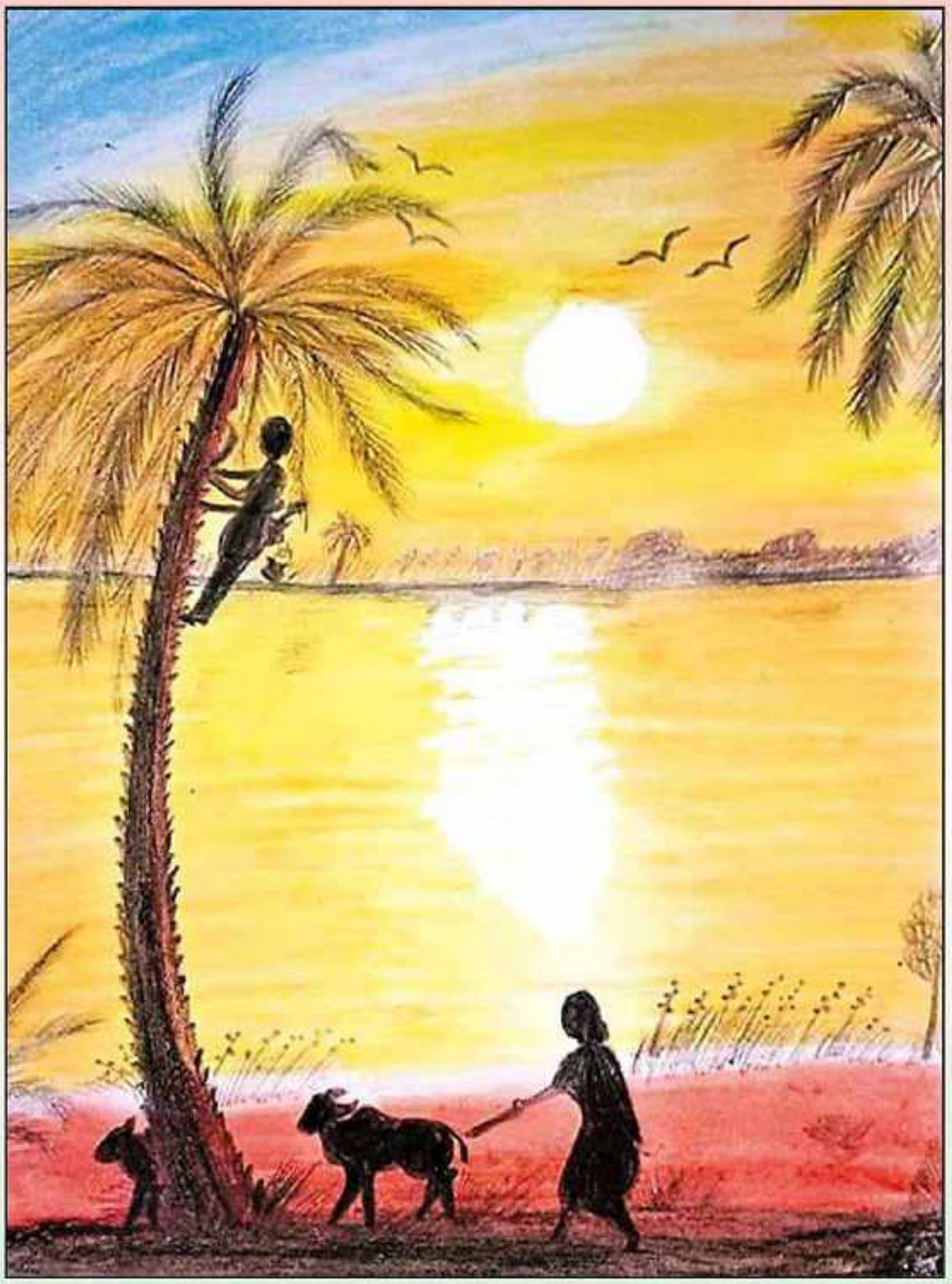

রাইসা ইন্তেসার ইমরান, অষ্টম শ্রেণি, বীণাপানি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা